ধ্রুবতারা

Central Texas Bengali Association, Austin, Texas

October 2024 | বঙ্গাব্দ ১৪৩১

PRIME FAMILY CARE

LITTY VADAKKAN APRN, FNP-C

- ACCEPTING NEW PATIENTS
- ANNUAL PHYSICAL / BLOOD WORK / PAP SMEAR
- SAME DAY SICK VISITS
- FLU/ STREP/ COVID TESTING & TREATMENT
- SELF-PAY FOR UNINSURED
- ALL MAJOR INSURANCES ACCEPTED

YOUR ONE-STOP CLINIC FOR PRIMARY CARE!

aetna · Medicare · Humana · United Healthcare · Cigna · BlueCross BlueShield

512-400-4025

1000 GATTIS SCHOOL RD SUITE 440 ROUNDROCK TX 78664

Email - care@primefamilycare.com | Web - www.primefamilycare.com

সুচিপত্র

Cover picture – Maa Durga	Cynthia Ceil	1
Photograph – Apart from Modernisation	Rumku Chowdhury	4
Executive Committee		5
সম্পাদকীয়		6
President's Corner		8
CTBA Activities 2024		10
মন্থরা	অমিয় বাসু	12
ভোলা মন রে আমার	দেবশ্রী দাশগুপ্তা	14
হারায় যে মন	প্রবাল দাশগুপ্ত	15
কিনারা	প্রবাল দাশগুপ্ত	15
এ মায়া প্রপঞ্চময়	কেকা বসুদেব	16
অরোরা বোরিয়ালিস	মৈত্রেয়ী চক্রবর্তী	23
আশা	মালবিকা বসু	30
বিচার চাই	মানস দে	33
গিনিপিগ	পাপিয়া দাসগুপ্ত	33
এক চতুর্থাংশ	পাপিয়া দাসগুপ্ত	33
সাগর পারের গল্প	মোনামী পাল রায়	34
Art – Pakhi shob kore rob	Arunangshu Saha (6 yrs)	38
স্মৃতিচারন – কারিগরী বিদ্যালয়ে প্রবেশ	পার্থ মুখার্জী	39
Art – House	Andreas (Dev) Dutta (6 yrs)	42
আকাশপ্রদীপ	প্রদীপ্ত দে	43
পুরুষ সিংহ	ঋত্বিক সেন	45
Art – Taj Mahal	Vimarsh Vadlamani (7 Yrs)	47
Comics – শিব ঠাকুরের FOMO	Ayan Guha	48
মুরগির মাংস	শ্রেয়সী দত্ত ভট্টাচার্য্য	53
চলার পথে	শুভা আঢ্য	55
ফাঁকিবাজি	শুভ্র চ্যাটার্জী	56
অক্সিজেন বনাম প্লুটো	সুদীপ সরকার	57
Art – Outside	Aarav Guha (10 yrs)	59
শয়তানের ঘন্টা বাজে	সুস্মিতা সেন	60
Art – Fall	Sharanya Chatterjee (5 yrs)	65

Art – All over India	Rajonya Saha (8 yrs)	65
আত্মীয় স্বজন	স্বপ্না মুখার্জী	66
তেঁনাদের কথা	তানিয়া মুখার্জী	68
প্রহশন, প্রশাসন এবং	দেবস্মিতা পাল চ্যাটার্জী	71
A regular Saturday	Joyeeta Banerjee	73
Pompei: Two-thousand-year-old whispers	Aurobindo Dasgupta	74
A Very Long Journey	Shivnath Dutta	76
Reflections at Journeys' End	Sumit DasGupta	79
Art – Puja	Tanishee Bose (7th Grade)	84
A Visit to a Baltic City – Oslo, Norway	Sunit K. Addy	85
Art – Katyayani	Sanghamitra (Mithu) Deb	90
Recent Graduates		91
Photograph – Aspiration, before taking Flight	Ratula Sarkar	93

DISCLAIMER

The views, thoughts and opinions expressed in this magazine belong solely to the authors and do NOT reflect the views or the official position of the Central Texas Bengali Association.

Apart from Modernisation – Rumku Chowdhury

Executive Committee

Central Texas Bengali Association | www. ctbaaustin.org

Dibyajyoti Bhattacharji
President

Arjun Pal Chowdhury
Vice President

Pushpak Bhattacharjee
General Secretary

Abhirup Mazumder
Treasurer

Pujo

Anindita Roy Bardhan

Rupa Mukherjee

Samira Ghosh

Suma Dasgupta

Magazine

Shubha Addy

Debasmita Paul Chatterjee

Ritwik Sen

Cultural

Basundhara Roy Chowdhury

Damayanti Banerji

Nandini Banerjee Deb

Suman Sen

Food

Srirupa Chatterjee

Priyanka Bhowmick

Debayan Saha

Avijit Sarkar

Technology & Innovation

Diganta Sengupta

Arnab Kumar Saha

Operational Excellence

Asish Das

সম্পাদকীয় – শুভা আঢ্য

বন্ধুরা,

আমাদের অস্টিনের মাতৃবন্দনায় আপনাদের সাদর আহবান জানাই। যদিও ঘাসের সবুজ চাদরে শিশির ভেজা শিউলির আল্পনা নেই, টেক্সাসের গ্রীষ্মের তাপে শরতের স্নিগ্ধতা তবু মা আসছেন এই আশ্বাসে আমাদের মন প্রাণ উন্মুখ হয়ে আছে। বাঙালির ঘরে মা আসেন ঘরের মেয়ে উমার বেশে ও সেই বিশ্ব জননী উমা মাকে আমরা কন্যা স্নেহেই বরণ করে আনি আমাদের ক্ষুদ্র আয়োজনের আঙিনায়। মায়ের শান্তরূপ যেমন ঘরে ঘরে শান্তির ছায়া এনে দেয়, তেমনিই দুর্গতিনাশিনী দুর্গার রুদ্র রূপে তিনি আগমন করেন অসুরের নাশের মনন নিয়ে। আজ পৃথিবী, ব্যাধিপীড়িত, হিংসাজর্জর, অস্থির। আমাদের একান্ত প্রার্থনা জগৎ জননী মা যেন এবার এসে পৃথিবীর সর্ব বিঘ্ন নাশ করেন ও ধরিত্রী আবার দেখা দেয় শান্তি সমৃদ্ধির রূপে উজ্জ্বল হয়ে।

পূজার দিনে একটি পূজা সংখ্যা হাতে নিয়ে হঠাৎ খুশির ঢেউতে ভেসে যাওয়া এ আমাদের অনেকেরই প্রিয় স্মৃতি। অস্টিনে সেন্ট্রাল টেক্সাস বাঙ্গালী এসোসিয়েশন সৃষ্টি হওয়ার আগেও পূজা সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে, সংঘমিত্রা (মিঠু দেব)এর আগ্রহে ও তত্ত্বধানে। বেশ কিছুদিন পরে পত্রিকার "ধ্রুবতারা" নামটি দিয়েছিলেন আমাদের কৃষ্ণা গুপ্ত , একটি কম্পেটিশনএর মাধ্যমে। কেন ধ্রুবতারা? আমাদের পত্রিকার নামটি বহুকাল ধরে সৃষ্টির আকাশে উজ্বল হয়ে প্রকাশ পাবে বলে।
পূজার পত্রিকা গুলি আমাদের বাঙ্গালী এসোসিয়েশন এর অমূল্য নিদর্শন। আমরা গত প্রকাশিত পত্রিকা গুলি থেকে অস্টিন এর বাঙালিদের ক্রমবর্ধমান ইতিহাস জানতে পারি ও সেই সময়ের অস্টিন শহরেরও নানান খবর জানতে পারি। পূজা সংখ্যাগুলি শুধুমাত্র মনোরঞ্জনের জন্যই নয়, সেগুলি ইতিহাসের উৎসও বটে।

সেই কথাটি মনে রেখে, আর আপনাদের সবার ভালো লাগবে বলে, আমরা অনেক উৎসাহ, পরিশ্রম ও ধৈর্যে ধরে, আমাদের সাধ্যমতো সংগ্রহ করা গল্প, রচনা ভ্রমণ কাহিনী, আলোক চিত্র ও অঙ্কনগুলি ধ্রুবতারার পাতায় পাতায় ভরে তুলেছি। প্রতিবারের মতো এবারেও দেশের কিছু ও এখানকার অন্য শহরের লেখাও আমরা পেয়েছি। সে জন্য আমরা কৃতজ্ঞ।আমাদের আশা যে এবারের ধ্রুবতারা আপনাদের মনোরঞ্জন করবে ও আগামী বছর আরো অনেক সেন্ট্রাল টেক্সাস বাঙ্গালী এসোসিয়েশন এর সদস্যরা এগিয়ে আসবেন ধ্রুবতারাকে আরো সুন্দর করে তুলতে।

সকলকে শারদ শুভেচ্ছা, নমস্কার ও প্রীতি জানাই।

ধ্রুবতারা

DISCLAIMER
The views, thoughts and opinions expressed in this magazine belong solely to the authors and do NOT reflect the views or the official position of the Central Texas Bengali Association.

সম্পাদকীয় - দেবস্মিতা পাল চ্যাটার্জী

গল্প হোক। আমাদের CTBA ধ্রুবতারা পরিচালিত এবং পরিবেশিত একটি আলোচনা মুলক অনুষ্ঠান বা Talk Show, যেটি ২০২৩শে আমরা সম্প্রসারণ শুরু করি YouTube জনমাধ্যমের CTBA channel-এ। আমাদের এই প্রয়াস অস্টিন বঙ্গবাসীদের মধ্যে কিছুটা হলেও জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। অন্তত বলতে পারি আমরা যতটা আশা রেখেছিলাম, আমাদের দর্শকবৃন্দ তার থেকে অনেক বেশী সাড়া দিয়েছেন এবং আমাদের অনেক বেশি উৎসাহ যুগিয়েছেন। আন্তরিক ধন্যবাদ তার জন্য।
এভাবেই গুটি গুটি পায়ে আরও একটি বছর প্রায় অতিক্রম করতে চলল আমাদের "গল্প হোক"। এবছর "গল্প হোক" এর দুটি পর্ব ইতিমধ্যে মুক্তি পেয়েছে ;

১) Cross Culture Kids
২) Planning for Golder Years

এবং আশা রাখছি আমরা Season 2 তে আরও একটি পর্ব আপনাদের উপহার দিতে পারব। প্রথম থেকেই আমাদের প্রয়াস ছিল, গল্প হোক এমন একটি অনুষ্ঠান হবে যেখানে আমাদের এই প্রবাসী জীবনের নানাবিধ সমস্যা আমরা নিজেদের মত করে আলোচনা করব এবং অংশগ্রহণ করবেন আপনারাই, মানে আমাদের অস্টিন বাসি বঙ্গ সমাজের অধিবাসি বৃন্দ, আপনারাই তুলে ধরবেন আপনাদের সমস্যা, আর আপনারাই আপনাদের সেই প্রসঙ্গে এযাবৎ অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেবেন। উদ্দেশ্য হল, সেখান থেকেই খুঁজে নেব আমাদের সমাধান গুলিও। এক্ষেত্রেও আমরা অত্যন্ত সৌভাগ্যশালী যে প্রতিবার আমাদের আমন্ত্রনে নির্বাচিত অংশগ্রহণকারীরা উদাত্ত হৃদয়ে তাদের অমুল্য সময় ব্যয় করে আমাদের অনুষ্ঠানটি মনগ্রাহি ও সমৃদ্ধ করে তোলেন। অশেষ ধন্যবাদ তাঁদের।

এবার আসি আমাদের ধারাবাহিকটিকে আরও একটু উন্নত করার প্রয়াসের কথায়। যেকোনো শৈল্পিক প্রচেষ্টায় বিভিন্ন খামতি থেকেই যায়। বিশেষ করে প্রজুক্তিগত ত্রুটি গুলো আমারা নিজেরাই বেশ কিছুটা পেশাদারিত্বের অভাব বুঝতে পারি। কিন্তু কিছুটা দায়িত্ব তো আপনাদের মানে দর্শককুলকেও নিতে হবে! আমাদের অনুরোধই বলুন কি অনুযোগই বলুন এগিয়ে আসুন আপনাদের মতামত নিয়ে। এক্ষেত্রে দ্বিধা, কুন্ঠা কিছুকেই প্রশ্রয় দেবেন না। এটা আপনাদের দ্বারা আপনাদের জন্য অনুষ্ঠান সুতরাং ৭০ ভাগ উন্নতির দায়িত্ব বর্তায় আপনাদেরই ওপর। আমরা তো হাত বাড়িয়েই আছি, অপেক্ষা শুধু আপনাদের feedback এর। এগিয়ে আসুন। **আসুন গল্প হোক।**

ধ্রুবতারা

DISCLAIMER
The views, thoughts and opinions expressed in this magazine belong solely to the authors and do NOT reflect the views or the official position of the Central Texas Bengali Association.

President's Corner

Dibyajyoti Bhattacharji
Austin, TX, 2024

Dear All,

As I reflect on the year gone by, I am filled with immense pride and gratitude for the vibrant and supportive community that we have built together at CTBA. Our organization has continued to grow, thrive, and embody the rich cultural heritage of Bengal, all while embracing the values of inclusivity, collaboration, and unity.

This year has been both rewarding and challenging. We successfully organized a diverse range of events, we celebrated Saraswati Puja which was a beautiful reflection of our dedication to nurturing the future generation, with children enthusiastically participating in various cultural performances, we organized our 'Annual Picnic' where we all came together and enjoyed a day full of outdoor fun, games, events and camaraderie.

Through our event 'Kobi Pronam' we paid tribute to our great poets of Bengali literature and celebrated the timeless works of Rabindranath Tagore, Kobi Nazrul Islam and other luminaries, we also had a vibrant Ananda Mela where we celebrated the eve of the festive season of Bengali calendar with various merchandise, craft and food stalls!. We also expanded our outreach through charity drives and educational programs. We had organized a winter cloth donation drive, food donation drive, book donation drive and summer camps, these initiatives have strengthened our commitment to giving back to society.

However, we faced significant financial challenges due to rising inflation. This has impacted the cost of organizing our events and day-to-day operations, making it more difficult to sustain our initiatives. Moreover, we incurred a major financial loss when we had to make the difficult decision to cancel the much-anticipated Babul Supriyo show, which was a centerpiece of our cultural calendar. This decision, though financially burdensome, was taken in solidarity with the RG Kar Medical College incident back in Kolkata, where the safety and dignity of students and faculty were at stake.

I take pride on behalf of the entire CTBA 2024 Committee and extended Community members in greater Austin area that we stood by our principles, taking a stand for what is right. In doing so, we not only showed our unity and resolve but also paved the way for other Bengali associations in the U.S and abroad to act with integrity. While this decision came at a great financial cost, it was a reminder that our values as a community are our greatest asset.

Despite these challenges, we remained resilient. We were able to replace the artist and host a grand musical event with Madhubanti Bagchi, which turned out to be a very successful show . Thanks to the generous contributions of our extended community members, patrons and sponsors, as well as the dedication of our committee members, we continue to host vibrant events and foster a sense of positivity and belonging within our community.

And finally its time to celebrate the most awaited event of the year Durga Puja, Durga Puja is not just a festival for us, it is a homecoming, a time to come together as a community, and a celebration of our shared heritage and values. We have series of cultural events, puja, anjali, musical events with artists from India, delicious food and many more.

None of this would have been possible without the tireless efforts of our dedicated committee members, volunteers, and well-wishers. Your unwavering support, passion, and hard work have ensured that our association continues to thrive, creating a home away from home for Bengalis near and far.Thank you once again for your enthusiasm, engagement, commitment and trust. Together, we will keep the flame of our heritage burning bright.'Asche Bochor Abar Hobe'

DISCLAIMER

The views, thoughts and opinions expressed in this magazine belong solely to the authors and do NOT reflect the views or the official position of the Central Texas Bengali Association.

WORLD FINANCIAL GROUP

Life/Visitors Insurance?

Estate planning? Long term Care?

One stop shop for all your financial questions.
Call today for quotes/questions!

ASHUTOSH SHYAM
5157085545

www.ozoneinsurance.com

Services offered

- Holistic Financial Planning
- 24/7 Notary Service
- Weath Management
- Auto/Home/Life/Visitor's Insurance
- Financial Education

Actively looking for new hires

CTBA Activities 2024

CTBA Saraswati Puja Celebration

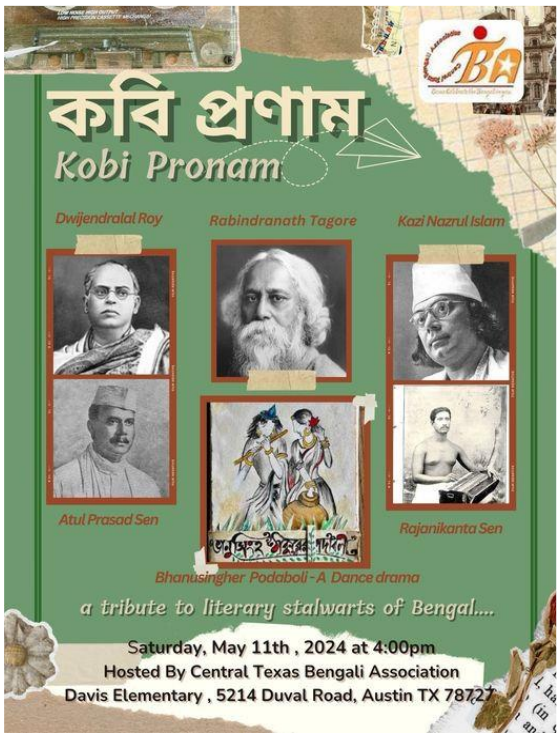

Golpo Hok

Available at the CTBA Austin YouTube channel

Kolpotoru - CTBA Giving Back

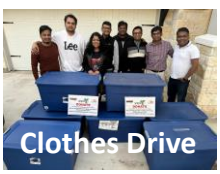

CTBA Annual Picnic

Anandamela Celebration

Summer Art Camp for Kids

Independence Day Celebrations

CTBA Lakshmi Puja 2024

Sunday, Oct 19, 5:00 PM – 9:00 PM

মন্নুরাম

অমিয় বাসু

রাজা ভূপেন্দ্র নারায়ণ রায়ের উত্তর কলকাতার সাত মহলা বাড়ি, আজ তিন মহলায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। অবস্থাও অতি ভগ্নপ্রায়।

ভূপেন্দ্র নারায়ণের এক ছেলে এক মেয়ে। মেয়ে মৃন্ময়ীর কলেজ শেষ করার আগেই বিয়ে হয়ে গেল। ভূপেন্দ্র নারায়ণ বিত্তবান ঘর দেখেই মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলো। গভর্নমেন্ট কন্ট্রাক্টর। ব্যারাকপুরে বড়ো বাগানওয়ালা বাড়ি। তবে জামাইয়ের হৃদরোগের কথা কন্যাপক্ষ কিছুই জানতোনা।

বিয়ের কয়েক বছরের মধ্যেই মৃন্ময়ী স্বামীকে হারালো। ব্যাবসার হালও মৃন্ময়ীকেই ধরতে হলো ।

ছেলে বীরেন্দ্র নারায়ণের কথা আলাদা। প্রচন্ড বিলাসী। বাবা ছেলেকে সাবধান করার চেষ্টাও করেছিল। কে কার কথা শোনে!

ঘোড় দৌড়ের শখতো ছিলই, পরে সেটা মোটর গাড়ির দিকে গেল। আগেকার মতো সেই খাজনাও নেই। জমি জমা বলতে কয়েকটা বাড়ি আর একটা ছোট গ্রাম। দেখা শুনোর অভাবে সবই গেছে বা যেতে বসেছে। নামি দামি গাড়ি আর কোনোটাই নেই। থাকার মধ্যে এক রংচটা অস্টিন আর একটা রেড এন্ড হোয়াইট স্প্রিংভাঙ্গা স্টুডিবেকার।

ভূপেন্দ্র নারায়ণ গত হবার আগে ছেলে মেয়েকে ডেকে বলেছিলো, 'যা রেখে যাচ্ছি, বীরেন তোর কোনো রকমে চলে যাবে। মৃন্ময়ী ভাইকে দেখিস। হিসেবে করে না চললে বীরেন রাস্তায় দাঁড়াবে।'

মৃন্ময়ী ওর দায়িত্বটা বোধহয় একটু বেশিই নিয়েছিলো। মাসে অন্তত দুবার আসতো। বীরেন্দ্রর স্ত্রী প্রতিমার সামনেই বীরেনকে বলতো, 'যদি খরচ কমাতে না পারিস আমার ব্যাবসায়ে লেগে পর। আর কিছু না হোক ছেলেরটার কথা ভাববি তো! তা কবে আসবি ব্যারাকপুরে?'

কথাটা প্রতিমার অপমান জনক মনে হতো। মৃন্ময়ী চলে গেলে বীরেন্দ্রকে বলেও ছিল, 'দিদিকে বোলো নিজের ব্যাবসা সামলাতে। আমাদের ছেলে আমরা বুঝব। এত ঘন ঘন বারাকপুরে যেতে হবে কেন?'

এর পরে যা ঘটল তা কিছুটা প্রত্যাশিত। মৃন্ময়ী ফোন করে প্রতিমাকে আবার ওর বাড়ি যাবার কথা বলাতে, প্রতিমা আর নিজেকে সামলাতে পারলোনা। আর কিছু ভেবে না পেয়ে বলে বসলো, 'আমাদের ড্রাইভার ছুটিতে গেছে।'

'কোন ড্রাইভার, কি নাম তার?'

'মন্নুরাম।'

'কোন মন্নুরাম?'

'কেন জহুরীরামের ছেলে!'

'জহুরী, বাবার পুরোনো ড্রাইভার! সে তো কবে রিটায়ার করে দেশে ছেলে গেছে!'

'হাঁ, ওরই ছেলে।'

'তা কবে আসবে দেশ থেকে ?'

'মাসখানেক পরে।'

'কোনো ড্রাইভার দিয়ে যায়নি ?

'না।'

প্রতিমা নিজেই ভাবেনি, কোনোদিন ও এতো সহজে এই ডাহা মিথ্যে কথাগুলো বলতে পারবে। ড্রাইভার রাখার ক্ষমতা ওদের অনেক দিন আগেই চলে গেছে।

* * * *

বীরেন্দ্র নারায়ণের সন্ধেবেলার আড্ডাটা ভালই জমে। অবসরপ্রাপ্ত ট্যাক্স কালেক্টর নিত্যানন্দ কর্মকার, প্রাক্তন স্কুল হেডমাস্টার সদানন্দ ঘোষাল, প্রবীণ চোখের ডাক্তার সুধীর মিত্র, উকিল মদন সাহা নিয়মিত হাজিরা দেয়। আরো কয়েক জন মোসাহেব গোছের লোকও আগে আসত। জমিদার বাড়ি এখন পড়তির দিকে তাই ওদের আসার প্রয়োজনও ফুরিয়েছে।

যেকোনো কারণেই হোক প্রতিমার কল্পনা প্রসুত ড্রাইভারের গল্পটা চাউর হয়ে গেল। ট্যাক্স কালেক্টর নিত্যানন্দই একটু ঠাট্টার স্বরে বলে উঠলো, 'তা বীরেন্দ্রবাবু শুনলুম নাকি আপনার ড্রাইভার দেশে গেছে? আপনাকে তো অনেকে দিন গাড়ি নিয়ে বেরোতো দেখিনি। বীরেন চুপ করে রইলো।

নিত্যানন্দ কর্মকার বলে চললো, 'মাঝে মাঝে অস্টিন গাড়িটাতো নিজেই চালাতেন। অন্য গাড়িটা কি চলমান অবস্থায় আছে? তা আবার ড্রাইভার কবে রাখলেন?'
উকিল মদন সাহাও ওর নিজের ভাষায় যোগ দিল, 'বীরেনবাবুতো ড্রাইভার রাখতেই পারেন। ড্রাইভারের নাম কি যেন কইলেন?'
'মন্নুরাম, বাবার ড্রাইভার জহুরীরামের ছেলে' বীরেন্দ্র ইতস্তত করে বললো।
'সেই জহুরীরাম ? ওর চোখ কেমন আছে?' ডাক্তার সুধীর মিত্রর প্রশ্ন ।
'সময় মতো ছানি না কাটালে যা হয় আর কি, আপনি তো ভালোই জানেন। ভয় পেয়ে কিছুতেই ছানি কাটাতে রাজি হলোনা। বাবার ওকে রিটায়ার করিয়ে দেওয়ার ওটাই আসল কারণ।'
'অন্য কারণও আসিল নাকি? উকীল মাদান সাহার আর আগ্রহের শেষ নেই।
'জহুরী তেজারতির ব্যবসা করবে না গাড়ি চালাবে!'
'এটাতো জানা ছিল না ।' মদন একটু মুচকি হেঁসে বলে উঠলো,
'হাঁ। জোড়াবাগানে মুচি পাড়ায় ওর দেশোয়ালী ভাইদের টাকা ধার দিতো।'
হেডমাস্টার সদানন্দ ঘোষাল কম কথার মানুষ। যা বলে, তা আড্ডাটাকে বেশ মুখরোচক করে তোলে।
উকিল মদনকে উস্কে দিয়ে বললো, 'জহুরীরামের নাম বদলানোর কাজটা তুমি কিন্তু ঠিক মতো করলে না, মদন!'
'সে গল্পটা তো শোনা হয়নি।' নিত্যানন্দ কর্মকার এই সুযোগটা কি ছাড়ে!
বীরেন্দ্র উকিল মদন সাহার দিকে চেয়ে বলল, 'আপনিই বলুন না।'
'কি আর কমু ? আমার কাছে আইলে ওটা আর হইতো না । জহুরী ওর নাম বদল কইরতে চাইয়াছিলো। কোন এক মুহুরীর পালায় পইড়া ঠকলো।'
'নাম বদল! ওটাতো ঠিক বোঝা গেল না ?' নিত্যানন্দ কিছুটা অবাকই হলো।

'জহুরীর আসল নাম জহুরী চামার, ওদের জাত ব্যবসা অনুযায়ী । 'অনিচ্ছা সত্বেও বীরেন্দ্রকে বলতে হলো।'
'আমরা তো ওকে জহুরীরাম বলে জানতাম!' এবার ডাক্তারের অবাক হবার পালা।
'জহুরী ওর আসল নাম বদলে অফিসিয়ালি জহুরীরাম করতে চেয়েছিলো। এক গাদা পয়সা খরচ করে কয়েস মাস পরে ও যখন সার্টিফিকেটা পেলো, দেখা গোলে ওতে লেখা আছে জহুরীরাম চামার।'
বীরেন্দ্রর কথা শেষ করার আগেই হাঁসিতে শোরগোল পরে গেলো ।

* * * *

হটাৎ এক সোমবার সকালে মৃন্ময়ীর ফোন পেয়ে প্রতিমা অবাক।
'কি ব্যাপার দিদি সব ঠিক আছে তো! আপনি অফিসে যাননি?'
'হাঁ তা আছে। বেরোতে যাবো, হটাৎ এক ড্রাইভার এসে হাজির। তুমি বা বীরেন কি তোমাদের ড্রাইভার মন্নুরামকে আমার কাছে পাঠিয়েছ?'
প্রতিমা হাসবে না কাঁদবে ঠিক বুজে উঠতে পারলো না। কাঁপা কাঁপা গলায় প্রতিমার উত্তর দিলো, 'না তো ।'
'তবে আমি ব্যাস্ত ছিলাম বলে আমার সঙ্গে দেখা না করেই চলে গেছে।' মৃন্ময়ী জানাল ।
প্রতিমা কিছুটা স্বস্তির নিঃস্বাস ফেলে, 'এখানে এলে জিজ্ঞেস করবো ' বলেই তাড়াতাড়ি ফোনটা রেখে দিল।

* * * *

তার পরের দিন সাত সকালে উকিল মদন সাহার ফোন।
'বীরেনবাবু আপনার ড্রাইভারেরে কি জহুরীর মতো দেখতে নাকি?'
আর কিছু ভেবে না পেয়ে বীরেন্দ্র উত্তর দিল 'ছেলেকে তো বাবার মতই দেখতে হবে।'
'তবেতো আমি ঠিকই দ্যাকসি।'
'কোথায় দেখলে ?'
'বাজার যাবার রাস্তায় আরকি।'

এক সম্পুর্ন মনগড়া চরিত্র, অনেকের কষ্টকল্পনায়, রক্তমাংসের মানুষ হয়ে দাঁড়ালো!

ভোলা মন রে আমার

দেবশ্রী দাশগুপ্তা

অনেককাল পর শনিবারের সন্ধ্যাটা খালি পেলাম আমরা। তেমনটা হলে আমরা শহরের কোনো এক নতুন রেস্তরা পরখ করে দেখি। তাই সেদিনও মেনু দেখে, কিছু গবেষণা/ বিবেচনা করে একটা রেস্তরা ঠিক করা হলো আর পতিদেব ফোন করে একটা reservation করে রাখলেন।

বিকালে তৈরি হচ্ছি, নীচের থেকে সুধোলেন, “রেস্তোরা র নাম মনে আছে? direction লাগবে।”
এই মরেছে! নাম তো মনে নেই! কী হবে এখন? ভুরু কুঁচকে দুজনেই চিন্তা করছি.....
"একটা ফুলের নাম ছিলো না?" উনি খুশি হয়ে বললেন, "মল্লিকা!"
"ধেত ! ওতো বাংলা নাম!"
"মল্লীকার ইংরাজী কী?"
"তা জানি না, তবে মল্লিকা বা তার ইংরাজী নয়"
অবশেষে মাথায় একটা বুদ্ধি খেলল, বললাম তুমি ওদের ফোন করেছিলে না? reservation এর জন্য?"
উনি বুঝতে পারলেন আমি কী বলছি। দু-একটা নং dial করতেই একটি গলা ভেসে এলো "Magnolia Restaurant!”
উনি বললেন, "Just confirming our reservation”
আমায় গর্বিত হয়ে বললেন "জানতাম ম দিয়ে নাম।"

আজকাল রান্না করতে খুব আলসেমি আসে। গরিমসি করতে করতে বিকালে কোনরকমে রান্না চাপাই। উনি সেসময় gym এ এক্সর্সাইজ় করতে যান আর আমিও উর্ধশাসে রান্না সেরে YouTube খুলে হয় Bollywood dance কিংবা strength training, বা balance, কিছু একটা workout করে নিই যাতে বিনা অপরাধ বোধে খেতে বসতে পারি।
সেদিন উনি তৈরি হতে উপরে যাচ্ছেন। নেমে এসে "ওই যা:" বলে আবার উপরে উঠলেন । আবার নিচে নেমে, বন করে ঘুরে, গজ গজ করতে করতে উপরে উঠলেন। এবারে নেমে এসে আর গজগজানিতে কুলোলনা, নিজেকে গালাগাল দিতে দিতে আবার উঠতে শুরু করলেন। ভয়ে ভয়ে শুধলাম, "কী হয়েছে গো?"
“মোজা আনতে উপরে যাচ্ছি আর উপরে গিয়ে আরেকটা কাজ সেরে খালি হাতে নেবে আসছি। এই নিয়ে তিনবার!”
আমার চেপে রাখা হাসি দরজা বন্ধ হবার পরে তবেই লাগাম ছাড়লো।
একদিন হাতে একটু সময় থাকায় ভাবলাম নিচের ঘরটায় একটু swiffer চালিয়ে নিই। এই যা: swifferএর
তারটা গেলো কই? খোঁজ! খোঁজ! এই তো কোনায় আউটলেট এ গোঁজা থাকতো! একেবারেই হাওয়া হয়ে গেল?
এই গ্যাজেট টার ওপর এতো dependent আমি আজকাল, কি হবে এখন?
আচ্ছা, আমার কাজের মেয়েটা আবার ভুল করলো কি?
মেয়েটি অনেকদিন ধরে কাজ করছে আমার এখানে, যখন ওরও ছেলেমেয়েরা ছোট।
ওর একটি ছোট্ট মেয়ে মাঝে মাঝেই মায়ের সাথে আসতো, সারা বাড়ি ঘুরঘুর করতো আর আমার কাছে বসে পাকা গিন্নির মতো বকবক করতো। তারাও এখন বড় হয়ে স্কুল কলেজ শেষ করে চাকরি বাকরি সংসার নিয়ে ব্যস্ত। আমাদের বাড়িও এখন খালি, মারিয়া এলে আমরা পরস্পরের ছেলেমেয়েদের খোঁজখবর নিই।
তা ওর ও তো এখন বয়েস হয়েছে, ভুল ওর তো হতেই পারে!
সেদিন কাজের পর একটা ক্লিনিং এর বোতল নিয়ে গিয়েছিলো, নিজেই ভুল বুঝতে পেরে আবার ফিরে

এসেছিলা বকেছিলাম আমি, "আবার এই ট্রাফিক এর মধ্যে ফিরে এলে কেন? পরের বার আনলেই তো হতো।" মিষ্টি হেসেছিলো মারিয়া, পরের বার খেয়াল করে নিয়ে আসাটা হয়তো আরো কঠিন কাজ ওর পক্ষেও।
তাহলে ওই হয়তো খুলেছিলো তারটা vacuum লাগাবার আগো ওকে ফোন করবো কিনা ভাবছি এমন সময় উনি এসে তারটা হাতে ধরিয়ে দিয়ে গেলেনা
"কোথায় ছিল?"
"চেকবই রাখার ড্রয়ারে"
দেখো কান্ড! মারিয়া কে চেক দেবার সময় আমিই নিশ্চই ওখানে ভরে রেখেছি! মাঝখান থেকে Swiffer আর করা হলো না, যা সময় ছিল তার খুঁজতেই বেরিয়ে গেলো।

এমনি ভাবেই দিন যায় আজকাল... আদার টুকরো pantryতে ভরে রাখি, পচা গন্ধ বের হলে টের পাই। Refrigeratorএ কলম খুঁজে পাই, চশমা চলে যায় বাগানো আর মোবাইল ফোন? সেতো হাত থেকে নামালেই হাঁটা দেয়া ভাগ্গিস দুজনেরই একটা করে আছে, তাই এই বুড়ো বয়েসে এসে দুজনে সমানে একে অপরকে ফোন করে চলেছি।

হারায় যে মন

প্রবাল দাশগুপ্ত

হারায় যদি হারাক না মন
শাল পিয়ালের অন্দরে,
ময়না দোয়েল ডাক দিয়ে যায়
কার লাগি কোন অন্তরে।
লাল মাটিতে গাইছে বাউল
হাতে ধরা একতারা,
খোয়াই পারে হাট বসেছে
পসরা সাজায় ওই কারা।
গানের তালে দুলছে কোমর
বটের ঝুড়ি ঝুলছে ওই,
রবির গানে সন্ধ্যা সকাল
মাতাল যে হয় ভুলবো কই,
খেজুর রসের হাড়ি কাঁধে
চলছে হেঁকে আল ধরে।
মন যে আমার হারায় হেথা
শাল পিয়ালের অন্দরে।।

কিনারা

প্রবাল দাশগুপ্ত

মোর জীবনের বেদনখানি
কার ঝুলিতে করবো দান,
যা ছিল মোর জমা পুঁজি
হচ্ছে কেবল শূন্যস্থান।
জাপ্টে যত ধরতে যে চাই
যায় সরে সব আরো দূর,
চাদর সেদিন ছড়িয়েছিলাম
দিতে পারি যোজন দূর।
সামিয়ানা হচ্ছে ছোট
আসর যে আজ রয় খালি,
হাতে গোনা গুণগ্রাহী
খুশি হয়ে দেয় তালি।
সাথীরা সব চলতে সাথে
বাঁক নিয়ে যায় ভিন পথে,
মোর জীবনের মর্মব্যাথা
রয় যে গাঁথা ওই পথে।
কান্না হাসির দোল দোলানো
জীবন পুঁজি সঞ্চিত,
বিলিয়ে দিলাম বিধাতা মোর
সবই তোমার গচ্ছিত।।

এ মায়া প্রপঞ্চময়

কেকা বসুদেব

বছর দুয়েক আগে পড়শী মাক্তপিসির ছেলে পল্টনের বিয়ে খেতে গিয়ে যা দৃশ্য দেখেছিলুম ভাবতেও পারবেন না!
সুন্দর স্টেজের ওপর ততোধিক সুন্দর সাজগোজ করে নবদম্পতি দাঁড়িয়ে আছে, পাশে ফুল দিয়ে সুন্দর সেলফি কর্নার বানানো হয়েছে, যত খুশি ছবি তোলো নবদম্পতির সঙ্গে।
তাজ্জব ব্যাপার হল আমন্ত্রিতরা কেউ সেই ড্রামাটিক সিস্টেমটার ধারে কাছে ঘেঁষছে না। দূর থেকে দেঁতো হাসি হেসে পালাচ্ছে।
তার কারণটি নববধূর পাশেই বিরাজমান। মখমলের এক রাজসিক কৌচে বসা ইয়া কেঁদো এক হাস্কি। তার গলায় বাঁধা রেশমি রুমাল, অঙ্গের ঝিকমিকে হার্নেস, মায় কনের ডান হাতে ধরা ইউনিক ডিজাইনের বেনারসি বেল্ট – সব কটা নির্ঘাৎ কোনো প্রসিদ্ধ ডিজাইনারের শিল্পকর্ম। মানে, বেশ মহামান্য ব্যাপার স্যাপার।
বউয়ের দুর্দান্ত মেহেদী করা বাঁ হাতটি পল্টনের ডান হাতে জড়িয়ে আছে।

সত্যি বলছি, অত বড় বেঘো মার্কা হাস্কি কুকুর কোনো দিনও দেখিনি। সে কুটিল চোখে রিসেপশন বাড়ির আনাচকানাচ সার্ভে করে বেড়াচ্ছে। পল্টন দেখলাম স্টেজের ওপর কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সে কুকুরে বেজায় ভয় পায়, গলির নিরীহ সারমেয়কুলকে পর্যন্ত বাঘের মত ডরায়।
মাক্তপিসিকে জিজ্ঞেস করি, 'এমন সিংহবাহিনী জোগাড় করলে কি করে?'
শুনলুম, উঠতি বড়লোক শ্বশুরের পয়সা আর কনের রূপ দেখে পল্টন এমন মজা মজেছে, যে কুকুরের ব্যাপারটা ধর্তব্যের মধ্যেই আনেনি।
যে ছেলে রাতবিরেতে বাধ্য কালু, ঝুলিদের রাস্তা জুড়ে শুয়ে থাকতে দেখলে পড়শীদের বলে একটু এগিয়ে দিতে, সেও দেখি সিঁটিয়ে দাঁড়িয়ে হাস্কির দিকে চেয়ে আল্লাদ করছে, 'হ্যাল্লো টয়! তু তু তু!'
রূপ আর রুপোর এমনই মহিমা!

ওই কেঁদো কুকুর, যার নাম নাকি টয়, সে অবশ্য বিশেষ পাত্তা টাত্তা দিচ্ছে না। মেজাজও অপ্রসন্ন। তু তু শোনা মাত্রই দাঁত খিঁচিয়ে গড় গড় আওয়াজ করছে।
কিছুক্ষণ পর সইতে না পেরে পল্টনপত্নী নিচু গলায় কর্তাকে ধমক লাগায়, 'তু তু বললে টয়ের অপমান হয়, নিজেকে কুকুর কুকুর লাগে।'
'তবে ও কি?' পল্টনের মামাতো বোন তুয়া আকাশ থেকে পড়ে...
'আমার ভাই!'
'তাও ভালো বয়ফ্রেন্ড বলেনি', পাড়ার সর্দার বৌদি বাঁকা হাসেন, 'এই কুত্তা নিয়ে মাক্তপিসির কপালে অশেষ দুর্গতি আছে, এই আমি বলে রাখলুম! রিসেপশনে এক হাতে বর আর এক হাতে কুত্তা! তওবা! তওবা!'
দুনিয়াদারির বিশেষজ্ঞের কথা কখনো মিথ্যে হয় না। প্রথম ট্রেলার দেখা গেল ফুলশয্যার রাতেই। তুয়ার কাছে শুনলুম, গরদের পাঞ্জাবিতে সেজে রোম্যান্টিক মুডে পল্টন বাসর ঘরে ঢোকা মাত্র ঘ্যা ঘো করে বিকট এক গর্জন হল, আর নব বর বাইরে ছিটকে এসে পড়লো। টয় নাকি মালকিনের সঙ্গে ঘুমোয় জন্ম থেকে, শয্যায় অন্য কারো উপস্থিতি বরদাস্ত করে না।
নববধূ পরামর্শ দিয়েছে, 'তাড়াহুড়োয় কাজ নেই। ওকে একটু ট্রেনিং দিয়ে নি, তোমায় পছন্দ করতে শিখুক। তারপর নয় ঘরে শুতে শুরু করো। ওইসব ফুলশয্যা টয্যা তখনই হবে খোন।'

দ্বিতীয় ট্রেলার এলো সাত দিনের মধ্যে। মাক্তপিসির কুড়ি বছরের পুরোনো কাজের লোক ঝুমাদি চাট্টি বাসক পাতা নিতে এসে শুনিয়ে গেল, 'ও বাড়ির কাজ ছেড়ে দিলুম গো!'
তাজ্জব ব্যাপার! মাক্তপিসির টাকায় ঝুমাদি কোঠাবাড়ি তুলেছে, ছেলের চাকরি হয়েছে পল্টনের দয়ায়,

ফেবিকলের মত মজবুত সেই জোড়ের সম্পর্ক চিড়ল কি করে?
কেন আবার? ওই টয়ের জন্য!
সে নাকি যেখানে সেখানে অ্যা করে ঘর নোংরা করছে, আর পরিষ্কার করতে হচ্ছে ঝুমাকে, ওসব তার পোষাবে না!
'যার কুকুর সে পরিষ্কার করবে, তুই করবি ক্যান?' আমার শাশুড়ির প্রশ্নের উত্তরে জানা গেল, ওই একই প্রশ্ন পল্টনও বউকে করেছিল; উত্তর এসেছে, 'আমার বাবা নোংরা পরিষ্কার করার লোক রেখে দিয়েছিল, আমি বাবার পরী!'
মাক্তপিসি আধুনিক শাশুড়ি, আর বেজায় নিরীহ; তাঁরও বৌমাকে পরী বানানোর সদিচ্ছা প্রবল। তাই টয়ের অ্যা পরিষ্কারের লোক রাখতে রাজি।
কিন্তু মোটা মাইনের বিনিময়েও কেউ রাজি হল না। পাড়ার গৃহকর্মী ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট বাপির মায়ের সাফ কথা, 'ছেলের বউকে বল পরিষ্কার করতে। পুষতে পেরেচে, আর গু ঘাঁটতে পারবে নি? নোকের বাড়ি খেটে খাই বলে কি ঘেন্না পিত্তি নেই কো?'

মাক্তপিসির মাথায় হাত। সবেধন নীলমণি একটি মাত্র ছেলের বউ। বড় ছেলে বুল্টন আগেই বলে রেখেছে, বিয়ে টিয়ে করবে না, মিশনে গিয়ে ব্রহ্মচারী হবে। বাড়িতে থাকেও না বিশেষ। ছোটছেলেকে অনেক তুইয়ে বুইয়ে বিয়েতে রাজি করিয়েছেন। তোষামোদ করে একদিন নোংরাও পরিষ্কার করিয়েছিলেন, কিন্তু সে বমি টমি করে অস্থির। মাকে বলে রেখেছে, আর একদিন ওই কম্মটি করালে সেও দাদার মত সংসার ত্যাগ করবে।
মাক্তপিসি নিজে যে সংস্থায় দীক্ষিত, তাঁরা শিব জ্ঞানে জীব সেবায় বিশ্বাসী। তাই তিনি নিজেই কদিন চেষ্টা করেছিলেন শিব রূপী জীবটির কৃতকর্ম পরিষ্কার করতে, নাকে আঁচল দিয়ে। কিন্তু বেতো রুগী, তাই সুবিধে করতে পারেন নি।
সারাদিন বাড়িটার ওপর কুকুরের মলমূত্রের সুগন্ধ লৌহ যবনিকার মত ভারী হয়ে থাকে। অনেক রাতে পাড়ার পেঁচো মাতাল পটা টলতে টলতে এসে পরিষ্কার করে দিয়ে যায়। ঘরে পিসির বন্ধুবান্ধবদের আনাগোনাও কমে আসে সুগন্ধের চোটে।

আর এক বখেরা - কুকুরের ভোজন। তুয়া বলে, সুন্দর বাটিতে করে পুষ্টিকর খাবার গুছিয়ে সামনে ধর, সে মহামহিম একবার উদাস নয়নে সেদিকে চাইবে, তারপর আনমনে দূরে তাকিয়ে বসে থাকবে। মাঝে মাঝে আড়চোখে এর ওর পানে চাইবে। বাটি থেকে গরস তুলে তুলে তার মুখে ঢুকিয়ে দিলে, তবে খেয়ে উদ্ধার করবে, নয়তো না!
'তাতে অসুবিধেটা কোথায়? বউই তো খাওয়ায় নিশ্চয়ই?' নাক সিঁটকে জানতে চাই; যদিও নিজেদের বাড়ির অভিজ্ঞতায় জানি, পশু চিকিৎসকেরা পইপই করে ওই কম্মটি করতে মানা করেন। খাইয়ে দেবার অভ্যেস করলে কুকুর গোল্লায় যায়।
'তবেই হয়েছে!' তুয়া শন শন করে ওঠে, তার নতুন বৌদিদির ওসব ঝক্কি নেওয়ার দরকার হয়েছে নাকি কোনো দিন? বাপের ঘরে যে অ্যা পরিষ্কার করতো, সে তোয়াজ করে খাইয়েও দিত।
আর এক উটকো বিপদ, টয় খাবার মুখে তোলেনা বলে নতুন বউও কিচ্ছুটি খেতে চাইছে না।
মাক্তপিসি বেয়ানকে ফোন করেছিলেন, টয়ের সেই সোনার টুকরো খিদমতগারটিকে এ বাড়িতে পাঠানোর জন্য। কিন্তু সে বেঁকে বসেছে, ওই জাঁহাবাজ কুকুরের হাত থেকে একবার মুক্তি পেয়েছে, আর ঝক্কি ঘাড়ে নিতে রাজি নয়।

অগত্যা মাক্তপিসিই বসেছেন খাওয়াতে। কঠোর বৈধব্যব্রত পালন করা মানুষ, মাংস-ভাত ঘাঁটতে কি একটুও গা গুলোয় নি? কিন্তু গরজ বড় বালাই...
সেই সূত্রেই এলো তৃতীয় ট্রেলর।
নতুন বউয়ের শ্বশুরবাড়ির আলোচাল মার্কা পরিবেশ বিলকুল না পসন্দ। সকালে যখন ঘুম থেকে ওঠে, কর্তা-ভাসুর দুজনেই অলরেডি কাজে বেরিয়ে গেছে। ফাঁকা বাড়িতে টয়ের সঙ্গে খানিক আল্লাদ করে, ব্রেকফাস্ট সেরে বউ বেশ তরিবত করে স্নান সারে। তারপর বাপের বাড়ি রওনা দেয়, কি বান্ধবীদের সঙ্গে শপিং টপিং... মোট কথা, পারতপক্ষে শ্বশুর বাড়ি থাকে না। ফেরে একেবারে বরের বাইকে চড়ে

রাত আটটা নটা বাজিয়ে।

মাক্তপিসি আর টয় সারা দুপুর-বিকেল-সন্ধ্যে একসঙ্গে কাটায়। পিসি সকালে এক প্রস্থ স্নান করে, ঠাকুর সেবা, টয়ের ভোজন মিটিয়ে আবার স্নান করে নিজে খেতে বসেন। টয় হত্যে দিয়ে বসে থাকে টেবিলের পাশে, একটু সাত্ত্বিক আহারের লোভে। পিসি জানেন অনুচিত কাজ, তবু দুচার গ্রাস প্রসাদ দেন। খাওয়ার পর ভুরভুরে জর্দা পান মুখে পুরে তিনি খবরের কাগজ নিয়ে বিছানায় যান, পাশে মেঝেতে বসে টয় পানের বোঁটা চিবোয় আরাম করে...
বিকেলে ঝুমা আসে মাক্তপিসিকে হাঁটাতে নিয়ে যেতে। কাছেই খেলার মাঠ; সেখানে দু চক্কর কেটে তিনি গিয়ে বসেন পাশে দুর্গা মণ্ডপের আড্ডায়।
আগে টয় এই সময়টায় একাই থাকতো বাড়িতে, ইদানিং পিসি সঙ্গে নিয়ে যেতে শুরু করলেন। ওর এক্সারসাইজ দরকার।
কুকুর পালার অভিজ্ঞতা তাঁর আছে। ছেলেরা যখন ছোট ছিল, কর্তার পোস্টিং ছিল কালিম্পং; সেখানে একটা ভুটিয়া কুকুর পেলেছিলেন শখ করে...
প্রথম প্রথম ঝুমা ক্যাওম্যাও মন্দ করেনি, বন্ধুরাও অপ্রসন্ন হয়েছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে দেখা গেল টয় বোধহয় দু চার গ্রাস সাত্ত্বিক আহারের প্রভাবেই, বেশ সুবোধ টাইপ হয়ে উঠেছে। চুপচাপ পিসির সঙ্গে মাঠে যায়, ছেলেপুলেদের সঙ্গে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে খেলে, মন দিয়ে ঘাড় কাত করে আড্ডা গেলে। শেষ বিকেলে ফিরে এসে সুরসুর করে কলের সামনে দাঁড়ায়; পিসি তার পা ধুইয়ে ঘরে তোলেন।
আগে ফিরতেন সন্ধ্যে হলে, ইদানিং তাড়াতাড়ি ফিরতে হয়, কি জানি, বৌমা যদি হুটহাট ফিরে আসে? কুকুরকে বাইরে বের করা মালকিন পছন্দ করে না; রাস্তার নেড়িদের থেকে নাকি অসুখ আসবে। টয়ের টহলের কথা জানতে পারলে কুরুক্ষেত্র করবে। ভয়ানক জেদি আর রাগী। এক সকালে রাঁধুনি মণি ম্যাগী একটু নরম করে ফেলেছিল বলে বাটি শুদ্ধু ড্রেনে ফেলেছিল।

সব দিব্যি চলছিল, কিন্তু বিপদ এলো মাস খানেক পরেই। টয় ইদানিং রাতের বেলা তার সাবেক মালকিনের ঘরে শুতে যাওয়ার বিশেষ আগ্রহ দেখায় না। বউ অনেক তুইয়ে বুইয়ে নিয়ে যায়, সে ব্যাটা নাকি উশখুশ করে, গুঁতোয়, দরজা আঁচড়ায়.... বউ বাধ্য হয়ে দরজা খুলে দেয়, টয় গিয়ে মাক্তপিসির খাটের পাশে, ঠান্ডা মেঝেতে পেট দিয়ে শুয়ে আরামে ঘুমিয়ে পড়ে; এসি ঘরের আরামের তোয়াক্কা না করেই।
সুযোগ পেয়ে পল্টনও খুশি মনে নতুন বিয়ের নতুন পালঙ্কে নিজের জায়গা দখল করে...
মনে প্রচুর পুলক; বউয়ের চাকরির পরীক্ষার জন্য মধুচন্দ্রিমা আপাতত মুলতুবি আছে, কিন্তু মনে রোম্যান্স থাকলে মধু চাঁদ বারো বাই বারো ঘরেও নেমে আসতে পারে...
কিন্তু সে গুড়ে বালি! বউ রাত একটা দেড়টা পর্যন্ত মায়ের কাছে ফোন করে নাগাড়ে বিলাপ করে যায়, -'মা গো! শাশুড়ি আসলে মায়াবিনী, কি ফুসমন্তর করেছে, টয় আমায় দু চক্ষু পেড়ে দেখতে পারে না!'
-'এ বাড়ির খাবার খেলে বেশিদিন বাঁচবো না!'
-'এমন নাক উঁচু বেরসিক বাড়ি জন্মে দেখিনি'... ইত্যাদি ইত্যাদি।
পল্টন বেচারী মহা গোলমেলে এক সরকারি দপ্তরে টানা আট দশ ঘন্টা রোস্ট হয়ে এসে বেশিক্ষণ চোখ খোলা রাখতে পারে না। বউয়ের ফোন শেষ হওয়ার আগেই ঘুমিয়ে কাদা...
তাও বউয়ের বিলাপ একটু আধটু কানে যায় বৈকি! মনে সমবেদনা জাগে। অভ্যেস বড় খারাপ জিনিস, এই যে মোটে দিন পনেরো হল বউয়ের পাশে ঘুমনোর উপায় হয়েছে, এতেই মনে হচ্ছে আর কোনোদিন একা একা ঘুমোনো সম্ভব নয়। সেখানে টয়কে পাশে নিয়ে প্রায় পাঁচ বছর পাশাপাশি শুয়ে, আজ টয়ের উদাসীনতায় বউয়ের কত্তটা কষ্ট হচ্ছে - অঙ্কের ছাত্র পল্টন সে অনুপাতের হিসেব কষে বড় অনুতপ্ত হয়।

মাক্তমাসিও দুঃখের কাহিনী শুনে ছেলের হাতে কটা পানের বোঁটা তুলে দেন, 'এগুলো ঘরে নিয়ে যা, লোভে লোভে টয় চলে যাবে।'
প্রথমে খানিক গাঁইগুঁই করলেও পানের বোঁটা প্লাস আদি মালকিনের টানে টয় দোনামনা করে আবার

বিছানায় তার পুরনো জায়গায় ফিরে এলো। তবে মাস তিনেকে স্বভাব কিছুটা শুধরে যাওয়াতেই বোধহয় পল্টনকে ঘর ছাড়া করলো না। সেও কিঞ্চিৎ সাহস সঞ্চয় করে বিনীত ভাবে টয়ের মেঝেতে বিছানা করে দেওয়ার কথা তুললো।
আর ওমনি বিস্ফোরণ হল, 'শুতে হলে তুমি মেঝেতে শোও গে! লজ্জা করে না, অসহায় প্রাণীকে মেঝেতে শোয়াতে?'
অগত্যা পল্টনই মেঝেতে শয্যা নিল। একটু অপরাধ বোধ যে হয় না তা নয়। সোশাল মিডিয়া জুড়ে ভিডিওর পর ভিডিও – কুকুর শুয়ে আছে মানুষের সঙ্গে... খাবার খাচ্ছে এক পাতে, এমন কি মুখ থেকে পর্যন্ত তুলে নিচ্ছে... আর তার কিনা এক খাটে শুতে গা ঘিন ঘিন করে; আচ্ছা, দু দিন যাক, নিশ্চয়ই অভ্যেস হয়ে যাবে।
বউ টয়কে গল্প বলে ঘুম পাড়ায়... মায়ের সঙ্গে দীর্ঘ আলাপ করে... একলা ম্যাট্রেসে শুয়ে পল্টন মনের দুঃখে খানিক এপাশ ওপাশ করতে করতে কখন যেন ঘুমিয়ে কাদা হয়ে যায়...
এদিকে বাঙালির স্বভাব মত পড়শী মারফৎ বউ কিছু দিনের মধ্যেই জানতে পেরে গেল টয়ের পাড়া বেড়ানোর খবর। মুখে কিছু প্রকাশ করেনি, তবে ইদানিং নিজে যখন বেরোয়, বাপের পাঠানো গাড়িতে টয়কেও জোর জবরদস্তি উঠিয়ে নেয়, তার সম্পূর্ন ইচ্ছের বিরুদ্ধে।
মহিলা সমিতির মিটিংয়ে তুয়ার কাছে ট্র্যাজেডি কমেডির এই দুর্দান্ত পাঞ্চ শুনে হাসবো কি কাঁদবো ভেবে পাই না।

কদিনের মধ্যেই আমরাও টাটকা টাটকা এক ট্রেলার দেখলুম, খুড়ি, শুনলুম। পলিদিদিমণির নাতির অন্নপ্রাশনের নেমন্তন্ন খেয়ে পাড়ার মেয়ে-বৌরা ফিরছি একটু রাত করে, তুয়াও ছিল দলে।
রাস্তার ধারে পল্টনদের বেডরুম থেকে একজোড়া মানুষ ও একটি যান্ত্রিক গলার তুমুল ক্যাঁচাল হচ্ছে... দাঁড়িয়ে গেলুম...
দেখুন, ভুরু কোঁচকাবেন না, আমরা সব সাধারণ মানুষ, কোনো ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি নই। অমন রসালাপ শুনলে আপনারাও দাঁড়াতেন।
যাই হোক, লাইভ ও যান্ত্রিক নারী কন্ঠদুটিই প্রবল – প্রথমটি হল পল্টনের বউ, আর হাবভাবে মনে হল দ্বিতীয়টি শাশুড়ি; তিনি ফোনেই খাপ পঞ্চায়েত বসিয়েছেন। আর মাঝে মাঝে পল্টনের গলা – কিপটের হাতে বানানো মাখন রুটির মাখনের মত যৎসামান্য।
'মা'টা পুরো মায়াবিনী গো! নইলে টয়কে এ কদিনেই বশ করে ফেলে?' মেয়ে মা'কে নালিশ জানায়...
'এ মা! এসব বলতে নেই, মা ওর সাইকোলজি বুঝে সেই মত চলেছেন।' পল্টন মায়ের হয়ে মিনমিনে সওয়াল করে...
'আচ্ছা! যিনি এত সাইকোলজি বোঝেন, তার ছেলের কেন বিয়ের দু মাস পরও বউয়ের সঙ্গে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক হল না, জবাব দাও!' যান্ত্রিক গলা তড়পায়...
'সুযোগটা পেলুম কোথায়? খাটে টয় শুয়ে থাকে, বড্ড ভয় করে! কদিন মায়ের ঘরে শুয়েছিল, তখন আপনারা লম্বা লম্বা গল্প করতেন মাঝরাত অব্দি, আমার ঘুম এসে যেত।' পল্টনের মাখন গলা আবার মিনমিন করে...
'কী মিটমিটে শয়তান গো মা! তোমার সঙ্গে কথা বলার খোঁটা দিচ্ছে আবার! ইচ্ছে করে ঘাপটি মেরে পড়ে থাকে; পাশে নতুন বউ থাকলে বরের নাকি ঘুম পায়!' মেয়ের সুঁচের মত মিহি আর তীক্ষ্ণ গলা রিনরিন করে ওঠে...
'এটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট ইমপোটেন্সির কেস অথবা পরকীয়া। আমার সঙ্গে চিটিংবাজি? কালই উকিলের পরামর্শ নিচ্ছি!' খুব শিওর গলায় ফোন থেকে ভারডিক্ট এলো।
'মামণি, এসব কি বলছেন আবোল তাবোল?' পল্টনের গলা আঁতকে ওঠে...
'অ্যাই, তুমি আমার মাকে অপমান করলে?' বউয়ের কাঁদো কাঁদো তেজালো গলা সপ্তমে চড়ে...

এই অব্দি শুনে আমরা আর দাঁড়াই না, পিটটান দি...
রাস্তার আলোয় দেখলাম তুয়া পুরো ব্যাপারটা ফোনে রেকর্ড করে রাখলো। রেগেমেগে বলি, 'this is not cricket! ব্যক্তিগত কথা অজান্তে রেকর্ড করা পাপ!'
তুয়া পাল্টা বলে, 'কেন করলাম, বুঝবে!'

পরদিন শুনলাম নতুন বউয়ের মা-বাপ এসেছিল, তুমুল হম্বিতম্বি করে গেছে, আর সে টয় সমেত বাপের বাড়ি চলে গেছে।

কদিন পরই মাক্তপিসির ফোন, পল্টনের বউ দলবল নিয়ে আসছে, এখানে সালিশি সভা বসাবে। পৃষ্টবল হিসেবে শাশুড়ি যদি উপস্থিত থাকেন ভালো হয়।
তাঁর ধুরন্ধর বুদ্ধির ওপর পাড়া প্রতিবেশীর অগাধ ভরসা।
কিন্তু মুশকিল হল, শাশুড়ি ইদানিং ঘরে বসেই সন্ন্যাস আশ্রম পালন করছেন। জাগতিক ব্যাপার থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন (ডাঁহা মিথ্যে কথা, বৌমাদের প্যাঁচে ফেলার সব রকম জাগতিক ব্যাপারে তাঁর মহা আগ্রহ)। তাই তার প্রতিনিধি বিগ্রহ হিসেবে আমাকে উপস্থিত থাকতে হল।
সে এক অভিজ্ঞতা বটে!
নির্দিষ্ট দিন বেলা দশটা নাগাদ পল্টনদের বাড়ি গিয়ে দেখি চাঁদের হাট। মাঝের বড় হলটা, যেখানে বছরে একবার গুরুদেবের নামগান আর এন্তার খিচুড়ি হয়, সেখানে বাড়ির সমস্ত সোফা, চেয়ার, টুল, মোড়া দখল করে পল্টনের ডজন খানেক সম্বন্ধী ওলের মত ঘোরতর মুখ করে নতুন বউকে ঘিরে বসে আছেন। তাজ্জব ব্যাপার হল পাড়ার রুলিং পার্টির কিছু পরিচিত মুখও ওই দলে রয়েছেন।
মাক্তপিসি, পল্টন, তুয়া, তার বাপ মা, আর পাড়ার সর্দার বৌদিকে নিয়ে এদিকের ছিমছাম দলটি দেওয়াল ঘেঁষে একটি ম্যাট্রেসের ওপর মুখ চুন করে বসে আছে। বুল্টনকে ত্রিসীমানায় দেখা গেল না, সে নাকি পঙ্কিল সাংসারিক আবর্তে থাকবে না বলে হিমালয়ের মঠে গিয়ে বসে আছে।
মাক্তপিসির কোলে মাথা দিয়ে শুয়ে আছে টয়। অন্য দলের সঙ্গে এলেও পিসিকে দেখা মাত্র সে নেচেকুঁদে ঘর ভরে বাথরুম করে একসা করেছে। এখন শান্ত হয়ে বিশ্রাম নিচ্ছে।
চুপচাপ গিয়ে দেওয়াল ঘেঁষে বসি। ফিসফিসে খবর যা শোনা গেল, ওই দলের মধ্যে প্লেন ড্রেসে দুজন মহামানব আছেন। একজন কাউন্সিলর, যিনি বউয়ের আপন মামা, আর তাঁর পাশের চিমসে মত লোকটি নাকি মামার বুজুম ফ্রেন্ড কাম পুলিশের এক কর্তা।
শাশুড়ির উস্কানিতে, কর্তার অমতে এসেছি। দরকার কি ঝামেলায় জড়িয়ে? আমি বাপু কাটা সৈনিকের পার্টই করবো! নিরাপদ দূরত্বে দরজার কোল চেপে বসি, ঝামেলা বাড়লে ধাঁ হয়ে যাব...

সালিশি সভা শুরু হয়। মা মেয়েকে বলেন, 'বল মা, তুমি কি ভোগ করেছো!'
মেয়ে খানিক ফুঁপিয়ে, খানিক নাক টেনে বেশ একটা দুঃখ ভরা কাহিনী পেশ করলো... ছোটবাড়ি, ঘুপচি ঘর; বেতো রুগী শাশুড়ির হেঁড়ে গলায় সাত সকালে বেসুরো নামগান, তুকতাক করার রহস্যময় প্রতিভা ইত্যাদি স্টার্টারের পর বেশ তাড়াতাড়ি মেন কোর্সে চলে এলো - বরের অপদার্থতা। বিয়ের প্রায় তিন মাস অতিক্রান্ত, তবু তাদের মধ্যে কোনো মানসিক বা শারীরিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়নি।
এটা শোনা মাত্র ওদের ধার থেকে বিস্ময় সূচক সব ধ্বনি কানে আসে।
মেয়ের মামা সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির ঢংয়ে জামাইয়ের কাছে জানতে চান, 'পম যা বলছে সেটা কি ঠিক? তোমাদের মধ্যে কোনো খুক! খুক! ই স্থাপিত হয় নি?' (বউয়ের নাম পম, আর খুক খুক হল গে 'শারীরিক সম্পর্ক', মামাশ্বশুর জামাইকে সরাসরি ও কথা বলতে বোধহয় সংকোচ পান। তাই খুক খুক কাশি)।
'আজ্ঞে, ওটা হতে গেলে কিছু ক্রাইটেরিয়া লাগে, কোনো যান্ত্রিক ব্যাপার তো নয়!' পল্টন লজ্জায় লাল হয়ে তুতলে একসা...
'ইয়েস অর নো? আমি স্পেসিফিক উত্তর চাই! কোনো ধানাইপানাই নয়!' জেরার ধরন দেখে মনে হয় মামাশ্বশুর নির্ঘাৎ এককালে ওকালতি করতেন।
'নো!' পল্টনের গলা দিয়ে কোনমতে আওয়াজ বেরোয়...
'কেন?'
জামাই মাথা নিচু করে থাকে।

ছোট থেকেই আমার হাত, পা, জিভ - সব স্বাধীন। মগজ থেকে সিগন্যাল আসার আগেই নিজেরা বহু কাজকম্মো করে ফেলে। সেদিনও ব্যতিক্রম হল না, জিভ শন শন করে উঠলো, 'অমন একটা বাঘের মত কুকুর বিছানায় শুয়ে থাকলে মন থেকে সব রোম্যান্স কোপ্পুরের মত উবে যাবে!'

আমার কাউন্টারে মামাশ্বশুর বোধহয় খানিক ব্যোমকে গেলেন।
'পম যে এখানেও কুত্তাকে বিছানায় নিয়ে শোয় বলিস নি তো?' কাউন্সিলর ভাই এবার জেরার অভিমুখ দিদির দিকে ঘুরিয়ে দেন।
'আমি জানতুম না।' দিদি নির্বিকার, 'আর হলেই বা, একটা অবোলা জীবের ওপর এত আক্রোশ কেন? স্বার্থপর জীব, ভাবে পৃথিবীতে শুধু তারাই সব সুখ পাবে, অন্য প্রাণীদের কোনো অধিকার নেই!'
ভাষণ শুনে মনে হয় যেন PETA র সদস্য।
'কাকীমা, একটা কথা বলি শুনুন, আপনার মেয়ের যেমন কুকুরকে লাই দেওয়ার অধিকার আছে, তেমনি সারাদিন পর খেটে এসে আপনার জামাইয়েরও কুকুর নিয়ে এক খাটে না শোয়ার পুরো অধিকার আছে।' আমার জিভ আবার যথেচ্ছাচার করে।
'একশো বার', এবার প্লেন ড্রেসের পুলিশ সাহেব আসরে নামেন,' কিছু মনে কোরো না দিদি, কুকুর আমিও পালি, কিন্তু পম টয়কে নিয়ে অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করে।'
'আরে, মায়ের সঙ্গেই তো মেয়ের কুকুর নিয়ে চুলোচুলি হয় দু দিন অন্তর!' মামাশ্বশুর ধুয়ো তোলেন।
'এখন কথা ঘোরানোর চেষ্টা হচ্ছে বাইরের লোক ডেকে এনে? টয় যখন ও ঘরে থাকতো না, তখনও কোনো সম্পর্ক গড়ে ওঠে নি কেন?' শাশুড়ি এবার মোক্ষম প্রশ্ন করেন।
'গড়বে কি করে? তখন তো আপনি ডিউটি দিয়েছেন। প্রতিদিন মাঝরাত অব্দি মেয়ের সঙ্গে বকবক করে।' নামী কোম্পানির HRDO তুয়া ঝটতি উত্তর দেয়।
'একদম মিথ্যে কথা!' মা মেয়ে ফুঁসে ওঠে, 'প্রমাণ করতে পারবে?'
'আমি বিনা প্রমাণে কথা বলি না!' তুয়ার হাতের মোবাইল চালু হয়... শুরু হয় আড়িপাতা রাতে পল্টনের মিনমিনে গলার দুঃখের কাহিনী, 'সুযোগটাই পেলুম কোথায়...'
শেষ যখন হল, ঘরে খানিক পিনপতন নিঃস্তব্ধতা।
তারপরই রিনরিন করে বেজে উঠলো পমের গলা, 'চিন্তা কর মামু, আমার ওপর গোয়েন্দাগিরি করা হচ্ছে! এক মুহূর্ত আর এ বাড়িতে থাকবো না!'
'অবশ্যই কাজটা ঠিক নয়, রেকর্ডিং আমাদের সামনেই হয়েছে, ওকে বকুনিও দিয়েছি। কিন্তু আজ মনে হচ্ছে এটা না থাকলে পল্টন মিথ্যেবাদী, ইমপোটেন্ট, চরিত্রহীন - সব একসঙ্গে হয়ে যেত।' পাড়ার সর্দার বৌদি কলকল করে ওঠেন...
'ঠিক ঠিক! এঁরা মাস্তুদিদের এগেনস্টে শুরু থেকেই চক্রান্ত করছেন। তাই রেকর্ড করে কোনো ভুল হয়নি। যুদ্ধ আর প্রেমে কিছুই অন্যায় না।' এতক্ষণ যে প্রতিবেশী অপোনেন্ট শিবির আলো করে বসে ছিলেন, তিনি চটপট শিবির বদলে ফেললেন।
আমাদের কাজ ফুরিয়ে গেল, বড়রা এবার মাঠের দখল নিয়ে নিলেন। সবেগে যুদ্ধ চলতে লাগলো। অপেক্ষাকৃত কম বয়েসীরা গুটিগুটি বেরিয়ে টয়ের সঙ্গে খুনসুটিতে মাতলাম।

খানিক পর ভেতর থেকে ডাক পড়লো, 'বৌমা, একবারটি এসো!' পল্টনের মামাশ্বশুরের গলা।
গিয়ে শুনলাম, মোটামুটি একটা স্থিতাবস্থা তৈরি হয়েছে। মেয়ের বাপ ধুরন্ধর বুদ্ধি, তিনি নিজের মেয়ে বউয়ের কীর্তিকলাপ দেখে শালা আর অফ ডিউটি পুলিশ সাহেবের সঙ্গে মন্ত্রণা করে একটি মধ্যমপন্থা বের করেছেন, নতুন বর-বউ দুজনেরই কিছু মানসিক মেরামতি দরকার।
পল্টনের তাতে কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু তার বউ-শাশুড়ি বেয়াড়া ঘোড়ার মত ঘাড় টেরিয়ে আছে। শাশুড়ি বলছেন, এটা নাকি স্রেফ তার মেয়েকে পাগল প্রমাণের অপচেষ্টা!
'তোমরা এখনকার মানুষ, চেনা পরিচিতের মধ্যে ভালো সাইকিয়াট্রিস্ট আছে নাকি?' মেয়ে বউকে পাত্তা না দিয়ে শ্বশুরমশাই জানতে চান।
'আছে তো কাকু, তবে মনে হয় আপনাদের ঠিক করা ডাক্তার হলেই ভালো, নয়তো পম ভাববে আমরা দুষ্টু ডাক্তার ফিট করেছি।'
উত্তর শুনে এতক্ষণ পর পল্টনের শাশুড়ি আমার ওপর কিঞ্চিৎ সন্তুষ্ট হন, বেশি ফরফর করলেও চিংড়ি মাছটার একটু বিবেচনা আছে!
আমায় অন্য ঘরে নিয়ে গিয়ে চাট্টি দুঃখের কথাও শেয়ার করেন। মেয়ে নাকি জন্ম থেকে আশকারা পেয়ে পেয়ে সাংঘাতিক জেদি। বিয়ের দুদিন পর থেকেই বর বা বরের সংসার কিছুই পছন্দ হচ্ছে না, বাড়ি ফিরে যেতে চাইছে। এদিকে মেয়ের দাদা তাতে একদম রাজি নয়; তার সামনে বিয়ে, আর

পছন্দের পাত্রীটিকে বোনের ঘোর অপছন্দ, সুতরাং বোন আর বউয়ে ভবিষ্যতে যে গজ-কচ্ছপের লড়াই বাঁধবে, তা ভেবেই বেচারীর মাথা খারাপের জোগাড়।
'বৌমা! এ মেয়ে আমার কথা শোনে না, এমন প্যাঁচ কষো, যাতে পাগলীর মাথা ঠাণ্ডা হয়।' মা হাত দুটি ধরে মিনতি করেন।
এবার বউকে ধরে আনা হল। তার সাফ কথা, পল্টনের হয় শারীরিক নয় চারিত্রিক দোষ আছে, ওর সঙ্গে ঘর করা সম্ভব নয়।
খানিক মাথা চুলকে বলি, 'মানছি তোমার কথাই ঠিক, কিন্তু কোর্টে মামলা উঠলে প্রমাণ করতে হবে তো? এক কাজ কর, দুজনেই সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে যাও, তিনি ঠিক বুঝবেন, আর তুমিও হাতে গরম প্রমাণ পেয়ে যাবে!'
পম খানিক তোলাপড়া করলো মনে মনে, তারপর বলে, 'অলরাইট, আমি রাজি!'
ঠিক হল, কোলকাতার বিখ্যাত ইনস্টিটিউটে নব যুগল যাবে তাদের বিয়ে বাঁচাতে।
পুরো দলটা ফিরে গেল পম সমেত। শুধু টয় কেন যেন মাক্তুপিসির পানের ডিবের সামনে গেড়ে বসে রইলো, অনেক কষ্টে তাকে গাড়িতে তোলা হল।

বয়স্ক সহৃদয় মনস্তাত্বিক রোগীর বিশ্বাস উৎপাদন করে এক বিশাল রহস্য আবিষ্কার করেছিলেন। বউয়ের একটি অপদার্থ প্রেমিক বর্তমান। তার উসকানিতেই পম বিবিধ কান্ডকারখানা ঘটাচ্ছিল। একবার যদি ডিভোর্সটা নিতে পারে, তবে বাড়ি গিয়ে দাদার বিয়ের পর আরও খানিক ঝামেলা করলেই কেল্লাফতে! গৃহশান্তির জন্য মা তাকে ঘাড় থেকে নামানোর তাল করবে, তখন ডিভোর্সী বেকার মেয়েকে কে আর বিয়ে করবে? এই অজুহাতে প্রেমিকটিকে সাজিয়ে গুছিয়ে বাপ মায়ের পেশ করা হবে।
তা, সে সাধ কি পূরণ হয়েছিল?
না আজ্ঞে! কাউন্সিলিং শুরু হওয়ার মাস তিনেকের মধ্যে পম এসে টয় সমেত শ্বশুর বাড়িতে থাকতে শুরু করলো। প্রথম প্রথম নানা উৎপাতও করছিল। তারপর একদিন দেখা গেল - রাতের বেলা টয় গুটিগুটি এসে মাক্তুপিসির পায়ের কাছে ঘুমোতে শুরু করলো। এমনকি সে বেগড়বাই করলে বউ আজকাল ভাসুর বুল্টনকে দিয়ে পেটানি খাওয়ানোর ভয় পর্যন্ত দেখায়।
আরও কিছুদিন পর, এক সন্ধ্যেয় পিসি পাড়ার সব বউকে ডাকলেন, হাতে হাতে পান-সুপারি, বাতাসা আর ইয়া বড় বড় রাজভোগ দিয়ে একগাল হেসে বললেন, তিনি নাকি ঠাকুমা হতে চলেছেন।

অরোরা বোরিয়ালিস

মৈত্রেয়ী চক্রবর্তী

ভোর রাতে মিত্তির বাড়ীর সামনে যখন গাড়ীটা এসে দাঁড়ালো, টিকলি ছাড়া আর কেউ প্রথমে টের পেলো না। টিকলি সারা রাত জেগে ওই সময়ে ঘুমোতে যায় বলেই দেখতে পেয়েছে গাড়ীটা থামল আর গাড়ী থেকে দু'জন নামল। তার একজনকে দেখে টিকলির দু'একটা হার্টবিট মিস হবার উপক্রম। উফ, এ যেন টিকলির মনের কল্পনা চোখের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। আর ঘুম হবে না বোধহয় তার।

টিকলির বাবার বন্ধু এই মিত্তির বাড়ীর এক ছেলে, এ বাড়ীতে বহু প্রজন্মের পুজো আজও খুব ঘটা করে হয়। প্রতিবারই টিকলির বাবা মা একদিন অন্ততঃ আসেন পুজো দেখতে। খুব ছোটতে টিকলিও এসেছে, টিকলি বড় হবার পর তার আসা হয়নি আর। বন্ধুদের সাথে আড্ডা মেরে, ঠাকুর দেখেই পুজো কাটাত টিকলি। এবার টিকলি, বাবা মায়ের জোরাজুরিতে এখানে আসতে বাধ্য হয়েছে। এবছরে মিত্তির বাড়ীর পুজোর অন্যতম আকর্ষন হলো, বহু বছর পর, এই প্রজন্মের ছেলের পুজোয় বাড়ী আসা। বিলেতে থাকা ছেলে বলে কথা, বাংলাদেশে মেয়ের অভাব নাকি? তাই মিত্তিররাও ফন্দি এঁটে তেমন সব বন্ধুদের বিশেষ নেমন্তন্ন পাঠিয়েছে যাদের ঘরে বিবাহযোগ্যা কন্যা আছে। টিকলি, তেমনই একজন। টিকলি পুরোটা শুনে প্রচুর হাত পা ছুঁড়েছিল ঠিকই, কিন্তু আসাটা ঠেকাতে পারেনি। আর এখন তো মনেহচ্ছে না আসলে কি ভুল করত। যদিও ওই আরেকটা মেয়ে কি যেন নাম সংযুক্তা না সম্পূর্ণা সে টিকলির কম্পিটিটর, মা বলেছে। কিন্তু তাতে কি? ওই মেয়েটা কেমন যেন অন্য জগতের মানুষ। ঠিক আছে, গাড়ী থেকে যে আরেকজন নামল কেমন কেমন টাইপ ওই মেয়েটাকে বরং বলবে তাকে দেখতে। আহা, কি আনন্দ। সারা বাড়ী জেগে উঠেছে ছেলে ফেরার আনন্দে। শুধু টিকলি নিশ্চিন্তে ঘুম দিলো। লুকিয়ে একটা ছবি তুলেছে টিকলি, বন্ধুদের পাঠাতে গিয়েও ডিলিট করে। বরং ছেলেটার সাথে সেল্ফি তুলে পাঠাবে। ঘুমের মধ্যে কতো কিছু স্বপ্ন দেখছিল টিকলি, বেশ এগোচ্ছিল, মা এসে ঘুম ভাঙিয়ে সব ভণ্ডুল করে দিলো।

"কী হলো? ডাকছ কেন? ধুর ভাল্লাগে না"

"ভাল্লাগে না, মানে কী? পইপই করে বলেছিলাম এখানে এসে রাত জাগবি না। পুজোর বাড়ী, সকাল সকাল উঠতে হয়, চান সেরে কাজে লাগতে হয়"

"পুজো? হোয়াট পুজো? মা এখনও তো ঠাকুরের সামনের চাদরই খোলেনি"

"ওঠ ওঠ দেখ কতো রকম নিয়ম কানুন হয় পুজোর। শিখতেও তো হয়?"

"শিখে কী করব? তুমি তো বললে, এ বাড়ীর ছেলেকে বিয়ে করলে নাকি লন্ডনে থাকব। সেও তো নাকি কতো বছর পরে এলো পুজোয়"

"চুপ চুপ, দেয়ালেরও কান আছে, ওসব কথা এখানে আর না, এখন ওঠ। এই কাপড়জামা দিয়ে গেলাম, চান করে নীচে আয়।"

চান সেরে, নিজের পছন্দের কাপড়জামা পরে, পাঁচনগেলা মুখ করে নীচে নামে টিকলি। ঠাকুর দালানে না গিয়ে আগে খাবার ঘরে যায়। অনেকেই বেশ খাচ্ছে সেখানে। বেশ কটা লুচি, তরকারি, মিষ্টি খেয়ে তারপর ঠাকুরের উদ্দেশ্যে উঁকি মারে। চারদিক দিয়ে ঘেরা বাড়ীর মধ্যিখানে বিশাল উঠোন, তার একপাশে ঠাকুর দালান। উঠোনে দেখে কতো মহিলারা ব্যস্ত সমস্ত হয়ে কাজ করছে, দু'একজন বয়স্ক পুরুষও কীসব দেখভাল করছে। কিন্তু মা বাবা কিম্বা আর যাকে দেখার ইচ্ছে টিকলির, কাউকেই দেখতে পেলো না। বরং সংযুক্তা না কি যেন নামের সেই মেয়েটা, কেমন সুন্দর একটা শাড়ী পরে, পিঠের ওপর ভেজা চুল ফেলে কাজেকম্মে লেগেছে। টিকলির কেমন জানি ওকে দেখে মনটা স্নিগ্ধ হয়ে গেলো। কিছুতেই মনে করতে ইচ্ছে হলো না এ টিকলির কম্পিটিটর।

"হাই। কী করছ গো?" বলে ওর গা ঘেঁষে বসে উঁকি দেয় টিকলি। অদ্ভুত সুন্দর পুজোর ঘরের মতো গন্ধ মেয়েটার গায়ে। একটা মিষ্টি হাসি ফিরিয়ে দিলো সে টিকলির উদ্দেশ্যে।

"এই তো দেখো না, আজ তো মায়ের অঙ্গরাগ হবে..."

"হোয়াটস দ্যাট মিন?"
"মা আজ নতুন কাপড় পরবেন, গয়না পরবেন। বলতে পারো কাইন্ড অফ পুজোও হবে"
"কিন্তু এখনও তো কাপড় দিয়ে ঢাকা দেওয়া"
"হ্যাঁ গো, বাড়ীর মেয়ে এতদূর পথ এসেছেন, তাকে কটাদিন সবার থেকে আড়াল করে বিশ্রাম দেওয়া আরকি। তারপর, সুন্দর করে সাজিয়ে তবে সবাইকে দর্শন করতে দেওয়া হবে"
"অ্যাই অ্যাই, তুমি তুমি, সরে বোসো ,সরে বোসো। চান করেছ? ছুঁয়ে দিলে নাকি ওকে? ইসস কি যে করো না তোমরা" মিত্র বাড়ীর বড় গিন্নির হাঁকডাকে চমকে ওঠে সকলে। পাশের বারান্দায় বসে থাকা মিত্র বাড়ী প্রবীণা সদস্যা রাজলক্ষ্মী দেবী অবধি। চট করে উঠে দাঁড়ায় টিকলি।
"হ্যাঁ আন্টি আমি তো চান করেই এলাম, আর আমি তো জাস্ট ওয়াজ আস্কিং হার..."
"শোনো মেয়ে, আন্টি নয় কাকি, জ্যেঠি, মাসী, মামী যা খুশী ডাকতে পারো, অনেক মিষ্টি মিষ্টি ডাক আছে বাংলায় কেমন? আর পুজোগণ্ডার দিনে এই সব পোশাক না পরাই ভালো। শাড়ী পরা তোমার কম্মো নয় ও আমি বুঝে গেছি। কিন্তু চুড়িদার পরো, ঘাঘরা পরো। তাই বলে এই সব টিশার্ট মিশার্ট পোরো না। আর চান করেছ, খেয়েছ না? তোমায় যেন খাবার ঘর থেকে আসতে দেখলাম"
"হ্যাঁ ব্রেকফাস্ট..."
"এটুকুনও কি জানো না ঠাকুর পুজোর কাজ ওই খাওয়া কাপড়ে করতে নেই। শোনো, তোমারও যদি কাজ করতে ইচ্ছে হয় তাহলে আজ দেখো, কাল সকালে চান করে ধোওয়া কাপড় পরে, না খেয়ে, এসে কোরো, কেমন? যদি খুব অসুবিধে হয় চানের আগে খেয়ে নেবে। অ্যাই গঙ্গাজলটা নিয়ে আয় তো, ছিটো এখানে"
"না আন্... সরি, জ্যেঠাইমা, আয়েম ফাইন"

গুটিগুটি পায়ে সরে পড়ে টিকলি। নিজের বরাদ্দ ঘরটাতেই যাচ্ছিল, কিন্তু, লক্ষ্য করে ওই ঠাকুমা হাতের ইশারায় তাকে কাছে ডাকছে। পাশটিতে মুখ কালো করে বসে, প্রচন্ড রাগ হচ্ছে টিকলির। কার ওপর রাগ করবে নিজেও বুঝতে পারে না।
"কী হলো দিদিভাই? রাগ হচ্ছে বুঝি?" রাজলক্ষ্মী দেবীর কথায় আরোও চোখে জল আসে টিকলির। মাথা নাড়ে সে।
"রাগ করিস না দিদিভাই, পুজোগণ্ডার দিনে কতোরকম ঘটনা ঘটে। তুই তো বাইরের লোক, এই আমাকে দেখ এ বাড়ীর তখনের একমাত্র ছেলের বউ হয়ে পুজোর কাজ কিচ্ছু জানতাম না। ওহ্ আমার শাশুড়ীমা কীইযে রাগ হতেন। এই আমার বড়বৌমার মতো। আমার তো খুব ছোট থাকতে বিয়ে হয়, আর বাবার বাড়ীতে পুজোটুজোর অত ধুম ছিল না। ঠাকুর ঘর ছিল, ঠাকুর মশাই পুজো করে দিতেন ব্যস। আমরা খেলে বেড়াতাম, নিজের নাম লেখা শিখতাম, কিন্তু পুজোর কাজ তখন শিখিনি" গল্পের গন্ধ পেয়ে চোখ মুছে, আরোও ঘেঁষে বসে টিকলি।
"তারপর? খুব বকা খেতে না?"
"খুউব। আসলে আমাদের বিয়েটা আমার শাশুড়ী মায়ের পছন্দ ছিলো না। আমার শ্বশুর মশাই আর তাঁর ছেলে, তাঁরা আমাদের বাড়ী, মানে আমার বাবার বাড়ী যেতেন। সেখানে তাঁরা আমায় দেখে পছন্দ করেন। তাঁদের ওপর রাগ করতে পারতেন না বলে আমার ওপর যতো রাগ দেখাতেন। এক বাড়ী লোকের সামনে ঠিক এমনি করেই ঝেড়ে কাপড় পরাতেন। আর কতো কীই বলতেন বাবাগো"
"মাই গড, তুমি হাসছ?"
"হাসব না? আমার তখনও হাসি পেতো, এখনও পায়। আসলে কি জানিস দিদি, যাঁরা পুজোর কাজ করেন, তাঁরা ভয়ে ভয়ে থাকেন। কোনো ভুলচুক হলেই তাঁরা দেবতার কোপে পড়বেন। এদিকে সব কাজ একা হাতে তো পারেন না করতে, তাই নিজের খামতি ঢাকতে অন্যকে বকেন"
"তুমি শিখে গেছিলে?"
"নাহ্ তেমন আর শিখলাম কই? পোয়াতী হলে পুজোর কাজ করতে নেই, এই খবরটা জেনে যেতেই আমি 'মা হবো মা হবো' করে পোয়াতী হয়ে গেলাম। ওই ওপরের বারান্দায় বসে দেখতাম"
"তুমি তো খুব দুষ্টু ছিলে। আচ্ছা, তারপরে?"
"খুব না? গল্প শুনতে পেয়ে বসে গেছিস। সব গল্প এখনই শুনবি? পুজো বাড়ী, যা যা ওই পুজোর সাজানো গোজানো দেখ গিয়ে যা"

"আবার যাবো? নো ওয়ে। গিয়ে কি করতে কী করবো আবার বকা খাবো। তারচেয়ে তোমার গল্প শুনি"
"এই তো গল্প। বড় খোকার বছর দুই বয়সে মেজ খোকা তার বছর দু'তিনের মধ্যে ছোট খোকা। তারপর বছর চারেক বাদে মেয়ে। চারটে বাচ্চা নিয়ে আমি একেবারে লেজে গোবরে হয়ে থাকতাম। তাদের নাওয়ানো, খাওয়ানো, ঘুম পাড়ানো করতে করতে আমার নিজের নাওয়া খাওয়া মাথায়। তখন ঠাকুরঝিরা নিজেরাই আমায় অব্যহতি দিলো"
"ওয়েট ওয়েট হোয়াট ইস ঠা_ঠা_"
"ঠাকুরঝি? ওহ্ আমার বরের দিদিরা"
"অ্যান্ড হোয়াট ইস দ্যাট, কী জানি দিলো?"
"অব্যহতী? মানে ছেড়ে দিলো আমায়। আর কোনোদিন পুজোর কাজ করতে হবে না, এরকমটাই বলে দিলো। কিন্তু মুস্কিল হলো, তাঁদের প্রত্যেকের বয়স বাড়ল, আমার যখন বিয়ে হয় তখনই তারা দু'তিন বাচ্চার মা একেক জন। তখনই কতো বয়স সব। পরে তো তাঁরাও প্রতিবছর এসে পুজোর কাজ করতে পারে না। আমার শাশুড়ীমা দেহ রাখলো। মানে মারা গেলো আরকি। ততোদিনে আমার ছেলেরাও বেশ খানিকটা বড় হয়েছে। আমি তো এবাড়ীর কর্ত্রী, ফলে আমি নিদান দিলাম যে, আমার ছেলের বৌরা এলে, তারা যদি চায় বা পারে তখন আবার ধুমধাম করে পুজো হবে। এখন নমো নমো করে হোক। তা' যে ক'বছর ওইটুকু পুজো হয়েছে, সে ক'ছর আমিই করেছি পুজোর কাজ। ঠাকুর মশাই বলে বলে দিতেন, আমি করতাম। তারপর বড় খোকার বিয়ে হলো, বড় বৌমা এসে আবার পুজো চালু করল। এখন তো তখনের থেকেও বেশী জাঁকজমক হয় দেখি"
"তোমার গ্র্যান্ড চিল্ড্রেন ক'জন?"
"সেটা আবার কী?"
"নাতি নাতনি না কি জানি বলে"
"ওহো, তাই বল। সব এক এক। বড় খোকার একটা ছেলে। মেজ খোকার একটা মেয়ে, ছোট খোকার ওই যে ছোট্ট ছেলে আর মেয়ের এক ছেলে"
"আজ সকালে যে এলো তারা কে?"
"তুই কী করে জানলি? দেখছিস বুঝি?"
"ন্না, মানে, আমি তো রোজ ওই সময়ে ঘুমোতে যাই। গাড়ীর আওয়াজ পেয়ে একটু দেখতে গেছিলাম। ঠিক দেখতে পাইনি"
"আমার বড় নাতি আর মেয়ের ঘরের নাতি। ওরা দু'জনেই এসেছে তখন"
"আমার না, ওই মেয়েটার জন্য খুব কষ্ট হচ্ছে। সকাল থেকে না খেয়ে কেমন কাজ করে যাচ্ছে। আমরা কতো গল্প করে নিলাম, ও বেচারা দেখো, শুকনো মুখে অর্ডার ফলো করে যাচ্ছে"
"কার কথা বলছিস? বুল্লি?"
"বুল্লি? ওর নাম বুল্লি? মা যেন কী একটা শক্ত নাম বলল"
"সম্পৃক্তা। হ্যাঁ, বড় শক্তই নাম। ওকে বুল্লি বলেই ডাকি আমি"
"আচ্ছা, ঠাম্মু, তোমার কী মনেহচ্ছে না, ওই আন্টি না মানে ওই জ্যেঠি এই বুল্লি মেয়েটাকে প্রেফার করছে?"
"প্রেফার মানে?"
"কী ইয়ং লেডি কী চলছে, অ্যাঁ? কাজ কম্ম না করে শুধু আড্ডা মারা?"
প্রেফার মানে কী, সে উত্তরটা আর দেওয়া হলো না টিকলির। রাজলক্ষ্মী দেবীর নাতি এসে দাঁড়ায় হাসি মুখে। টিকলি, কথা বন্ধ, দম বন্ধ করে বসে থাকে। চোখটাকে যে ঠিক কোনদিকে পাঠাবে বুঝতে পারে না। বাড়ীর মানুষদের একসঙ্গে কথা বলতে দেওয়াই দস্তুর। কিন্তু, টিকলি তো নড়তেই পারছে না। ইস, ওই জ্যেঠি ঠিকই বলে, পুজোর দিনে এসব টিশার্ট কেপরি না পরাই উচিত। সামনে এসে যে দাঁড়ালো সেও কেমন পাজামা পাঞ্জাবী পরা। কিন্তু এবার টিকলির মনে অন্য প্রশ্ন, এইই কি সেই? লন্ডনে যে থাকে? নাকি এ অন্য কেউ? দু'জন ছিল যে? ঠাম্মুর সাথে হেসে হেসে মজা করে কতো কথা বলে চলেছে, টিকলির কানে কোনো কথাই যাচ্ছে না, শুধু নাতি ঠাকুমা দু'জনের হাসি দেখে চলেছে সে। এক সময়ে লক্ষ্য করল উল্টো দিক থেকেও তার দিকে কৌতুহল নিয়ে তাকাচ্ছে কেউ। নাহ্ আর না, উঠতে যায় টিকলি, খপ করে হাত ধরে ফেলেন রাজলক্ষ্মী দেবী।

"অ্যাই মেয়ে পালাচ্ছিস কেন? পরিচয় করে যা" বলে টিকলিকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে বলতে থাকেন,
"এই দুষ্টুটা আমার মেয়ে সুবর্ণার ছেলে, স্বপ্নীল। আর এ কে বলত?" নাতির উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করেন রাজলক্ষ্মী। নাহ্ সে চিনতে পারে না টিকলিকে। তার মানে টিকলি যাকে পছন্দ করছে সে এ বাড়ীর সেই লন্ডনে থাকা ছেলে নয়। অন্ততঃ এটুকু জানা গেল। এরই মধ্যে দ্বিতীয় জনও হাজির। ভোর রাতে তাকে তেমন আকর্ষনীয় না লাগলেও এখন বেশ ভালোই লাগছে।
"আর, এই যে ইনি হলেন সৌম্যদীপ। আমার বড় ছেলে রত্নদীপের ছেলে" সে ও হঠাৎ বলা নেই কওয়া নেই একটি মেয়ের সাথে পরিচয় করে একটু বোকা বনে গেছে।
"আরে ও টিকলি রে, সেই, 'গালফোলা টিকলি'। মেজকার বন্ধু যে, নিরঞ্জন কাকু তার মেয়ে। তুই ও তো চিনিস, মেজমামার বন্ধুকে। তোরা সব ছোট থাকতে খেলতিস এক সঙ্গে। টিকলি অবশ্য বহুকাল আসেনি এ বাড়ী। নে তোরা যা এবার, দেখ গিয়ে পুজোর দিকে। আমিও একটু ঘরে যাই, ধরত আমায়" ।
সুযোগ পেয়ে বলতে গেলে দৌড়ে ঘরে যায় টিকলি, মায়ের রেখে যাওয়া চুড়িদারটা গলিয়ে নিতে হবে তার। কিন্তু প্রথমেই ঘরে এসে ধুপ করে শুয়ে পড়ল বিছানায়। চোখ বন্ধ করতেই দুটো কৌতুহলী চোখ ধরা দেয় আবার। চোখ খুলে একটু সময়ে দাঁত বের করে হাসে, আর মাথা চুলকে হিসেব কষে। নাহ্, কিছু একটা তার চোখে পড়েছে, সেটা যে কী সে ধরি ধরি করেও ধরতে পারছে না। আর এই এখানে আসার আগের থেকে শুরু হয়েছে 'গালফোলা টিকলি' শোনা। ধুর, উঠে চুড়িদার পরতে পরতে হঠাৎই বুঝতে পারে কী পড়েছে চোখে।

সে নাকি ছোটতে আসত এবাড়ীতে, এদের সাথেই খেলত। তখন খুব ফুলো ফুলো গাল ছিলো বলে সবাই 'গালফোলা টিকলি' ডাকত। একবার খেলতে খেলতে কোথায় বুঝি পড়ে গিয়ে হাঁটুর নুন ছাল উঠে গেছিল। তখন সব বাচ্চাগুলো একসাথে বলে গলা খুলে কেঁদেছিলো। একফোঁটাও মনে নেই টিকলির, কিন্তু আসার পথে মা বাবার কাছে আর এসে ইস্তক এ বাড়ীর কাকীদের কাছে এরই মধ্যে কতোবার যে শুনে ফেললো।
হাতে কোনো কাজ নেই, গল্প করার লোক নেই, যে বাড়ীতে ছোটোবেলায় আসত, সে বাড়ীটাও মনে নেই বলে সময় কাটানো প্লাস একটু মনে করার চেষ্টায় এ বারান্দা সে বারান্দা ঘুরতে ঘুরতে ছাদে পৌঁছয়।
"রাগ করেছ? কী করব বলো? কাকী সমানে আমায় কাজে ডাকছেন, এতো বড় পুজোর কাজ বলে কথা"
"নাহ্, রাগ করে আর কী করব? তুমি ছাড়া আর তো কেউ নেই কাজ করার, করো গে যাও। তোমার কাজ ফেলে এলেই বা কেন? 'এতো বড় পুজোর কাজ' যখন, করো সেটাই। আমি এসেছি তাতে কী?"
"তুমি গিয়ে বলো না কাকীকে। আমারই কী খুব ভালো লাগছে? মানদা দিদি, স্বর্ণ দিদি, এমনকি কাকী তো ওই টিকলিকেও বকে সরিয়ে দিলেন, আমি কী করব?"
"বুঝেছি। মা তোমায় কেন কাজে আটকাচ্ছে"
"কেন?"
"মা তো আজও মেনে নিতে পারেনি না? মা নিজে তোমায় সিলেক্ট করলে কোনো ব্যাপার ছিলো না। কিন্তু ছেলে সিলেক্ট করছে এটা কিছুতেই মানতে পারছে না। আর তাই তোমায় ঠাকুরের কাজে আটকাচ্ছে। যাতে তুমি কিছুতেই আমার ধারে কাছে না আসতে পারো। মা চায়, হয় টিকলি নাহলে পম নাহলে নিন্নি কাউকে একজনকে আমি সিলেক্ট করি। তাই, ওদের সবাইকে ডেকে পাঠিয়েছে। আমি এতোদিন কেন বাড়ী আসিনি সেটাও বুঝল না? গ্রাজুয়েশনের পর মাস্টার্সের অজুহাতে তারপরে পিএচডি, চাকরি সব অজুহাত দিয়ে দিয়ে দেরী করলাম। দেখছি, মা কে সরাসরি বলতেই হবে। তেমন হলে ঠাম্মুকে নাহলে বাবা, মেজকা, ছোটকা, পিসি সবাইকে দিয়ে বলাতে হবে। এখনও পুজোর আসল দিনগুলো তো পড়েই রয়েছে"।
ছাদ ফাঁকা দেখে নেমে আসতে গিয়ে নীচু গলায় কথার আওয়াজ পেয়ে দাঁড়ায় টিকলি। খুব সন্তর্পনে উঁকি মেরে দেখে, সম্পৃক্তা আর সৌম্যদীপ দাঁড়ানো। এই তো তার হিসেব মিলতে শুরু করেছে। যখন

ঠাম্মু ওদের পরিচয় করাচ্ছিল তখন স্বপ্নীল একদৃষ্টে চেয়েছিল তারই দিকে আর এই সৌম্য কেমন অপ্রস্তুত মুখ করে একবার দেখল তাকে ঠিকই কিন্তু ওর চোখ অন্য কাউকে খুঁজছিল। আর এই কারণেই ওই জ্যেঠিমা বুল্লিকে দিয়ে কাজ করাচ্ছে। কিন্তু পমদিদি, নিন্নি তারাও সব টিকলির কম্পিটিটর? এটাতো নতুন খবর শুনলো সে। পা টিপে টিপে কেটে পড়ে সেখান থেকে, কেউ দেখলে ভুল বুঝবে, ভাববে টিকলি আড়ি পাতছে বুঝি।

ওপরের বারান্দায় মনমরা হয়ে দাঁড়িয়ে নীচের ঠাকুর দালানে উদ্দেশ্যহীন তাকিয়ে থাকে টিকলি। সেখানে ঠিক তখনই কেউ নেই। সারাক্ষণ মোবাইল নিয়ে পড়ে থাকা মেয়ের কেন যে মোবাইলের দিকে তাকাতেও ইচ্ছে করছে না। সারা বাড়ীর বিভিন্ন ঘর থেকে হাসির আওয়াজ, কথার আওযাজ ভেসে আসছে। ছাদে দু'জন, বাকিরাও পুরো বাড়ীতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আনন্দ করছে, এক টিকলিই যেন নিজেকে কোথাও ফিট করতে পারল না। ঠাম্মুর ঘরে যাবে নাকি ভাবে একবার। জ্যেঠিকে খুঁজল একটু, তাতেও মা কাকীমারা হাসে তাকে। পুজোর কাজ করতে চায় টিকলি, তাহলে বুল্লি ছুটি পাবে ভেবে। কিন্তু জ্যেঠি তখন বিশ্রামে আর সন্ধ্যেয় তেমন কোনো কাজের হেল্প লাগে না। যেটুকু কাজ সে জ্যেঠিমাই করে নেয় শুনলো টিকলি। ক্ষিধে ক্ষিধেও পাচ্ছে। নীচে একটা বাচ্চা ছেলেকে দেখে টিকলি, সে বেচারাও কেমন একা একা বোকার মতো চারদিকে দেখছে। ওর কাছেই যাওয়া মনস্থির করল। চট করে নীচে নেমে গল্প জুড়ে দিল বাচ্চাটার সাথে। সে তার বাবা কাকার সাথে এ বাড়ী ঢাক বাজাতে এসেছে, মা মারা গেছে বলে বাবা গ্রামে রেখে আসেনি। বড়রা সবাই নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত তাই সে বেচারা একা। সোমেন নামের বাচ্চাটাকে টিকলি বোঝায় সেও ওর মতোই বড়দের সঙ্গে এসেছে বটে কিন্তু এখন একা। অনেকটা সময় কাটায় দু'জনে। দুপুরের খাবারও খাওয়ার ঘরে গিয়ে খায়। যে টিকলি নিজেই মাছ বাছতে পারে না, সে সোমেনকে সাহায্য করে মাছ বেছে খেতে। এখনও অবধি যে যার নিজের মতো খাবার ঘরে গিয়ে খাচ্ছে। পুজো শুরু হলে মানে মায়ের সামনের ঢাকা সরে গেলে তখন নাকি নিয়ম ধরে খাওয়া দাওয়া হবে। খাওয়ার পর নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে গল্প করতে বসে।
"অ্যাতো বড় বিসনা? কে ঘুমায় এখেনে? বিসনা এমন নরম হয়? এটা কি ভুলু? তোমার এটা?"
"হ্যাঁ রে, ও টেডি, আমার বন্ধু। অন্য সময়ের কথা তো জানি না রে, এখন আমাদের দিয়েছে এ ঘরে থাকতে। মা বাবা যদিও থাকছে না এঘরে"
"ক্যানো? তোমার একা ভয় করে না? আমার ভয় করে। মা মরে যাওয়ার পর থেকে রাতে খুব ভয় করে। আমি এখেনে শুই?" বলতে গেলে এক তরফা কথাগুলো বলে, হাত পা মেলে শুয়ে গড়াগড়ি দিয়ে নেয় সোমেন। টিকলি দেখে, চোখ বুজে ফেলেছে সোমেন। ওর জামাকাপড়ের হাল দেখে কষ্ট পায় টিকলি। সবাই যেখানে দারুণ পোশাকে ঘুরছে, সেখানে মা মরা এই বাচ্চাটা একটা মলিন জামা প্যান্ট পরা। হঠাৎই আইডিয়া পায় টিকলি। তার একটা বড় টেডিবিয়ার পুতুল সে সবখানে নিয়ে যায়। এখানে আসার আগে টেডিকে নতুন শার্ট প্যান্ট পরিয়ে এনেছে।
"টেডি, তোকে আবার নতুন কিনে দেবো রে, সরি বাবু। আপাততঃ আমার টি পরে থাক। এটা নতুন রে। তোর এই জামা প্যান্টগুলো সোমেনকে দেই? মনেহয় ওর হয়ে যাবে এগুলো"

ঢাকের আওয়াজ শুনে চমকে জেগে ওঠে টিকলি। বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে নামছে, আবার পুরো বাড়ী জেগে উঠেছে। নীচে ঢাক বাজছে। সোমেনকে তুলতে মন না চাইলেও ঠেলে তোলে। নিশ্চয়ই ওর বাড়ীর লোক ওকে খুঁজবে। চোখ মুখ জল দিয়ে ধুয়ে, নতুন জামা কাপড় পরিয়ে চুল আঁচড়ে দিয়ে নীচে পাঠায় সোমেনকে। নিজের কাজে নিজেই অবাক হয় টিকলি, একটা ভাই পেয়ে কেমন বড় দিদি হয়ে গেলো নিমেষেই। দৌড়ে বারান্দায় গিয়ে দেখে ঢাক বাজাচ্ছে স্বপ্নীল আর সৌম্যদীপ। সম্পৃক্তা শাড়ী বদলে একটা সুন্দর চুড়িদার পরেছে। সে ই মোবাইলে ভিডিও করছে বা লাইভে আছে। সবাই নীচের বারান্দায় আর মহিলারা একবার করে উলুধ্বনি দিচ্ছে আর বদলে যাচ্ছে ঢাকের বোল, বেড়ে যাচ্ছে ঢাকের স্পিড। জোরে লম্বা টানা শাঁখের আওয়াজ। আরেহ্, পমদিদি এসেছে। পমদিদির তো রেকর্ড আছে শাঁখ বাজানোর। তারমানে সৃজনদাদাও এসেছে? সে তো দারুণ ফটোগ্রাফার। পমদিদির বয়ফ্রেন্ড হলেও খুব বন্ধুত্ব তাদের মতো ছোটোদের সাথেও। আরেকপাশের বারান্দায় গিয়ে ঝুঁকে পড়ে দেখে তিলক আর নিন্নিও এসেছে। তিলক আর টিকলি নাকি মাত্র পাঁচ মিনিটের ছোটবড়। তাই নামও বাবারা একরকম রেখেছে। ছোটোর থেকে সবাই ওদের টুইনস বলে, দুই মায়ের কাছে জন্ম নেওয়া টুইনস। তার

কাজিন নিন্নি সেও যথেষ্ট বন্ধু ওদের। সোমেনও কেমন মিশে গেলো সবার সাথে, নীচে গিয়েই 'কাঁই নানা, কাঁই নানা' করে কাঁসর বাজাতে লেগেছে ঢাকের সাথে। বাড়ীর ছেলেদের দু'জনকে মাঝখানে রেখে বাকী ঢাকীরা সব কাঁধে ঢাক নিয়ে গোল করে নেচে নেচে বাজাতে লেগেছে।

চোখে জল আসছে টিকলির, সব্বাই উপস্থিত কিন্তু তার জন্য কেউ নেই। মা, বাবা, তিলক, নিন্নি, পমদিদি, সৃজনদাদা কেউ একবার ডাকল না, খুঁজল না । হঠাৎই নিজের পুরোনো স্বত্বা ফিরিয়ে আনে সে। ওপরের বারান্দা থেকেই ভিডিও করা শুরু করে। স্বপ্নীল যেন বার কয়েক তাকালো ওপরের বারান্দার দিকে? নাকি টিকলির মনের ভুল? চট করে ভিডিওটা পোস্ট করে বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়ায়। "এঞ্জয়িং বাড়ীর পুজো উইথ বাড়ীর লোকজন"। পোস্ট করার সাথে সাথেই প্রায় কমেন্ট আসতে শুরু করে। "কোথায় এটা?" "এখনই পুজো শুরু?" "ওয়াও" "এঞ্জয়" ইত্যাদি ইত্যাদি। টিকলি ডুবে যায় ফোনে।
"অ্যাই মেয়ে, পুজোর দিনেও ফোনের মধ্যে কী রে? চল নীচে চল" চমকে তাকিয়ে দেখে টিকলি একজন গোলুমোলু মিষ্টি মতো মহিলা দাঁড়ানো। হ্যাঁ, এঁকে সবার সাথে দেখেছে বটে, কিন্তু ইনি কে জানে না টিকলি। তাকে কেউ ডাকছে, ভেবেই অবাক হয টিকলি।
"আয়াম ফাইন আন্টি"
"তুই না নিরঞ্জনদা'র মেয়ে? কি মিষ্টি হয়েছিস রে। মিষ্টি তুই ছোটোতেও ছিলি, তখন তো মিষ্টি গালফুলো বেবি ছিলি। এখন স্মার্ট লেডি। ফাইন আবার কী? একা একা পুজোর দিনে কেউ 'ফাইন' থাকে না, বুঝলি?"
"থ্যাঙ্কস আ লট। কিন্তু তুমি কে? তুমিও আমাকে চেনো?"
"আমি সুবু পিসি রে। সকালে যে ঠাম্মুর সাথে গল্প করছিলি, তার মেয়ে সুবর্ণা। ওই যে, ঢাক বাজাচ্ছে স্বপ্ন, ওর মা। তোর এখনও কি সুন্দর চুল রে, ছোটো বেলায়ও এমনই ছিলো। চল চল নীচে যাই"

মোটামুটি টানতে টানতে তাকে নীচে নিয়ে যায় সুবর্ণা। নীচে গিয়ে সুবর্ণাই যেন ঠেলে দেয় টিকলিকে সবার মধ্যে। সব কষ্ট ভুলেই গেলো টিকলি।
রাত প্রায় দেড়টা বাজে। সারা সন্ধ্যে কীইযে মজা করল সবাই মিলে। ঢাক বাজানোর পর, লাইটিং আপ সেশান হলো। সারা বাড়ীর আলো জ্বালানো হলো; টুনি লাইট দিয়ে ডেকোরেটর সাজিয়েছে। ঠাকুরের সামনের ঝাড় বাতী জ্বলল। সকালের ফুলের গয়না খুলে, মা কাকীমারা ঠাকুরকে সোনার গয়না পরালো।যদিও তারা সব পর্দার এ পার থেকেই দেখেছে। একমাত্র সৃজনদাদা ফটো তুলবে বলে মা কাকীমাদের সঙ্গে যাওয়ার অনুমতি পেয়েছিলো। ঠাকুরের উদ্দেশ্যে কিছু মিষ্টি সরবত দেওয়া হলো, আড়াল থেকেই। পরে টিকলি, বুল্লি, নিন্নি সবাই মিলে পরিবেশন করল সেই প্রসাদী মিষ্টি আর সরবত। সৃজনদাদার সাথে সবার পরিচয় করালো পমদিদি। পমদিদিও মাস্টার্সের পর একটা জব করছে আর পিএইচডির জন্য রেডি হচ্ছে। যদিও এক টিকলি ছাড়া আর কেউই, সৃজনদাদাকে দেখে জ্যেঠির শুকনো হাসি লক্ষ্য করল না। একটা সুযোগে, মা কাকীমাদের অনুরোধ করে তারা যেন এই কটাদিন পুজোর কাজ করে। ছোটরা শুধুই মজা করবে। জ্যেঠিমারও মন গলিয়ে, বুল্লির ছুটি আদায় করে নিলো টিকলি। পুজোর কটাদিন আর বুল্লি কাজ করবে না। রাতের খাওয়াও জম্পেশ হয়েছে, ছোটোরা সবাই মিলে রেস্তোঁরাঁয় গেছিল। টিকলি মোবাইলে ঢুকে পড়েছে আবার। সোশ্যাল মিডিয়ার কমেন্টের উত্তর দিচ্ছে। নিজেদের ছবিগুলো দেখছে। কোনো কোনো গ্রুপফিতে দেখে স্বপ্নীল তার পাশে দাঁড়ানো, তার কাঁধে হাত রাখা। ইস, তখন খেয়াল করেনি তো টিকলি। ঘুম আসছে না। কুটকুট করে ছাদে পৌঁছয় টিকলি। ঘুমন্ত একটা বিশাল বাড়ী, কিন্তু আলো জ্বলছে প্রচুর, মনেহচ্ছে এক্ষুণি একটা কিছু ঘটবে, বাড়ী তারই অপেক্ষায়। ছাদ থেকে শহরের অনেকটা অংশ দেখা যায়। শহরও যেন ঘুমোতে পারেনি টিকলির মতোই। সব আলো জ্বালিয়ে কিছু একটা ঘটনার অপেক্ষায় রয়েছে।
"তাহলে, গালফোলা টিকলি, খবর কী? এখানে কেন, এতো রাত্রে?" চমকে তাকায় টিকলি। কখন যে নিঃশব্দে স্বপ্নীল এসে পাশে দাঁড়িয়েছে টেরই পায়নি সে। কী বলবে টিকলি? কথা তো চমকের চোটে বন্ধ; কিন্তু আবার সেই 'গালফোলা টিকলি'।
"কী? এখনও সেই? আগে সত্যিকারের গাল ফোলা ছিলি, আর এখন রাগ হলে গাল ফোলা" বলে হাসতে থাকে স্বপ্নীল।

"আর একবারও বলে দেখো"
"কী করবি রে? গালফোলা টিকলি?" আরোও গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে প্রায় ফিসফিস করে বলে স্বপ্নীল। রেগে দুমদুম করে হাঁটা দেয় টিকলি। আর থাকবে না পুজো বাড়ীতে।
"অ্যাই, অ্যাই টিকলি, কোথায় যাচ্ছিস?"
"সরো সরো, সরো একদম। আমি বাড়ী যাবো। এখানে তোমরা সবাই খারাপ"
"সরি সরি সরি, এই দেখ কান ধরছি, আর গালফোলা টিকলি বলবো না, প্রমিস"
"আবার? আবার?" স্বপ্নীলের হাসির ফোয়ারা দেখে রেগে ওঠে টিকলি। কিন্তু কোথায় যেন একটা ভালোলাগা বুরবুরি কাটছে টিকলির।
"জানিস, তুই একদিন নীচের উঠোনে পড়ে গেছিলি, সেদিন..."
"ওহ্ নো, নট এগেইন। এবাড়ীতে আসার পর থেকে এই গল্পটা না হলেও হান্ড্রেড টাইমস শুনলাম। আমি পড়ে গেছিলাম আর তোমরা সবাই কেঁদেছিলে, রাইট? ডু য়ু হ্যাভ এনি থিং আদার টু টক অ্যাবাউট?"
"আছেই তো। এগুলো চিনিস দেখ তো?" দুটো মিষ্টি দেখতে বোতাম আর একটা ছোট্ট কাপড়ের বো স্বপ্নীল মেলে ধরে টিকলির সামনে।
"মাই গড, এগুলো তো আমার..."
"হ্যাঁ, তোর জামার। সেদিন তো তুই ওই জামাটাই পরেছিলি। কেমন করে জানি লাফাতে গিয়ে না কিভাবে তুই পড়ে গেলি। জামা থেকে এগুলো খুলে পড়েছিলো। সেই থেকে পকেটে নিয়ে ঘুরছি, দেখা হলেই ফেরত দেবো তোকে। কিন্তু তারপর তো আর তুই এলিই না। এবারে দেশে আসার আগে, মা যখন বলল তুই আসবি, তখন ভাবলাম হয়ত এটাই লাস্ট চান্স এগুলো ফেরত দেওয়ার" কথা সরে না টিকলির। হাতের মুঠোয় এভাবে ভালোবাসা যে ধরা যায় কোনোদিন জানতই না টিকলি।
"দেশে আসার আগে, মানে?"
"কানাডা থাকি রে এখন। পড়াশোনা করে আপাততঃ সেখানেই আটকে গেছি"
"কানাডা? ও মাই গড, দারুণ সুন্দর না? কোন সাইডে থাকো তুমি, তোমার ওখান থেকে নর্দার্ন লাইটস দেখা যায়?"
"খুব সুন্দর দেশ। এখনও তোর আগ্রহ আছে অরোরা বোরিয়ালিস দেখার?"
"অফকোর্স আছে। আহ্ ওই একটাই তো ড্রিম আমার"
"তোর মনে আছে টিকলি, দাদুর একটা বই নিয়ে আমরা পড়তাম? তোকে নর্দার্ন লাইটস এর সম্পর্কে পড়ে শোনানোর পর তুই বলেছিলি, 'আমায় দেখাবি অরোরা বোরিয়ালিস?' আমি বলেছিলাম, বড় হই নিয়ে যাবো। টিকলি এনাফ বড় হয়েছি না, বল? যাবি আমার সাথে অরোরা বোরিয়ালিস দেখতে?"
বাড়ীটা, শহরটা যেন এই মধুর মিলনের অপেক্ষাতেই ছিলো। দুর্গাপুজোর বাকি দিনগুলোয় শুধু অরোরা বোরিয়ালিসের আলোই ঘিরে রইল টিকলির চারপাশ।

Bright Bee MONTESSORI
THEIR FUTURE IS OUR PASION
900 Nelson Ranch Road
Cedar Park, TX 78613
www.brightbeemontessori.com
contact@brightbeemontessori.com
512-348-6566

আশা

মালবিকা বসু

‘শম্পা, দেখে যাও ওনার কান্ড। সাতসকালে বেরিয়ে উনি কত মাছ কিনে এনেছেন’ উনি মানে এ বাড়ীর কর্তাবাবু। ‘আমাকে ঘুম থেকে না তুলে নিজেই একা একা বেরিয়ে গেছেন’
‘দেখো না, কত বড় বড় গলদা চিংড়ি, ভেটকি মাছের ফিলে নিয়ে এসেছেন। এদিকে আবার একটা আস্ত কাতলা মাছও এনেছেন দেখছি।’
‘কেন? উনি এতো বাজার করেছেন কেন, আপনারা কি অনেক লোকজন নেমন্তন্ন করেছেন?’
‘না, তা নয়, কাল উনি বলছিলেন আজ শম্পার জন্মদিন। এই প্রথম বাড়িতে এল। তাই তোমাকে খাওয়াবে বলে এতো বাজার করলেন। ৮০০ টাকা কিলো গলদা চিংড়ি, ভাবো একবার। কি যে জিনিসের দাম বেড়েছে, তা বলার নয়। তবে উনি খুব হিসেবী মানুষ। তোমাকে খাওয়াবে বলে ভালবেসে নিজের ইচ্ছেতেই উনি কিনে এনেছেন। ভালোই করেছেন। আমিও খুব খুশী হয়েছি।’

সুদেববাবু আর রমাদেবীর একমাত্র সন্তান সায়ন। সেই যে কলেজ পাশ করে আমেরিকাতে উচ্চশিক্ষার জন্য চলে গেল, তারপর এই প্রথম বাড়ীতে পা রাখলো। জিজ্ঞেস করলেই বলতো ছুটি নেই। রমাদেবী শান্ত প্রকৃতির, কিন্তু ওনার স্বামী একটু রাগি এবং জেদী । একবার যেটা ভাববেন সেটা করেই ছাড়বেন। সেজন্যই শম্পার জন্মদিন কানে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কত আয়োজন করে ফেললেন। এরকম মানুষ সচরাচর দেখা যায় না। আসলে ওনারা দুজনেই এককালে বাড়ীতে কোনো অনুষ্ঠান হলে লোকজন নেমন্তন্ন করে খাওয়াতে খুব ভালোবাসতেন। আসার আগে ফোন করে সায়ন ওদের বলেছিল,
‘আমি আমার সঙ্গে একজনকে নিয়ে যাচ্ছি। ওর নাম শম্পা। একেই আমি জীবনসঙ্গিনী করবো ভাবছি। তোমাদের সঙ্গে আলাপ করাতে চাই।’
শুনে প্রথমে দুজনেই চমকে উঠেছিলেন, কিন্তু কোনো প্রশ্ন করেন নি। কারণ, ওনারা ভেবেছিলেন যে এতদিন পর ছেলে আসছে, এলেই সব জানতে পারবে। বেশি কিছু বললে যদি আবার না আসে! এতদিন তো সায়ন বিয়েই করতে চায় নি। অবশেষে একজনকে যে পছন্দ হয়েছে, এই ভেবে ওনারা মনে মনে একটু খুশি হয়তো হয়েছেন। এমনিতে সুদেববাবু আর রমাদেবী দুজনেই খুব আধুনিক মনের মানুষ। তাই হয়তো মেনে নিয়েছেন। যাই হোক, আজ সাত দিন হলো সায়ন ও শম্পা বাড়ীতে এসেছে। ওরা আসার পর থেকে বাড়িটা সত্যি যেন গমগম করছে। বাবা, মা দুজনকেই আজ খুশি খুশি লাগছে। ওরা আসার আগে বাড়ীটা বাইরে থেকে ভূতের বাড়ি বলে মনে হতো। এখন সারাক্ষণ গলার আওয়াজ শুনতে পাওয়া যায়।

শম্পাকে দেখতে শুনতে ভালোই। ওরা দুজনেই বিদেশে একই কোম্পানিতে চাকরী করে। কাজের সূত্রেই ওদের আলাপ। যাই হোক, আজ বাড়িতে শম্পার জন্মদিন পালন করা হবে। সায়ন আগেই জন্মদিনের তারিখটা জানিয়ে দিয়েছিলো। তাই সকালবেলা রান্নাবান্নার তোড়জোর শুরু হয়ে গেছে। রান্নার মাসী মিনতিও তাড়াতাড়ি চলে এসেছে। কর্তাবাবুর হুকুম আছে, ভালো করে চিংড়ীর মালাইকারী রাঁধতে হবে। ভেটকি মাছের ফ্রাই করবেন গিন্নীমা। এরপর হবে কাতলা মাছের মুড়ো দিয়ে মুড়িঘন্ট আর পেটিগুলো দিয়ে দইমাছ। এসবই কর্তাবাবুর আদেশ। এতো রান্না করতে হবে জেনে মিনতি তো গজগজ করতে করতেই রান্নাঘরে ঢুকেছে। কিন্তু ওনাকে অমান্য করার কোনো সাহস তার নেই। সুদেববাবুকে সে রীতিমতো ভয় পায়। সায়ন বাড়ী ছাড়ার পর এতদিন বাড়ীটা যেন খাঁ খাঁ করত। ওর মা বাবা তো এতদিন শুধু পেট ভরানোর জন্যই খাবার খেতেন। ভালোমন্দ রান্না করে খেতে অনেকদিনই তাঁরা ভুলেই গেছেন। তাই আজ জন্মদিন উপলক্ষে এতো রকম রান্নার আয়োজন করতে দুজনেই খুব খুশী হয়েছেন।
‘শোনো শম্পা, তোমার জন্য কাল মাংসের কিমা আনিয়ে রেখেছিলাম। আমি জলখাবারে একটু লুচি, আর কষা কিমার তরকারি করেছি। তুমি সায়ন আর ওর বাবাকে নিয়ে টেবিলে বসে পড়ো। তুমি সেদিন বলছিলে কিমার তরকারি খেতে ভালবাসো, তাই করলাম আর কি? আর হ্যাঁ একটু পায়েসও করেছি। ওটাও একটু মুখে দিও। জন্মদিন বলে কথা।’

শম্পা হাসতে হাসতে বলল, 'আপনারা জানলেন কি করে বলুন তো যে আজ আমার জন্মদিন? সায়নের তো মনেই থাকে না।'
'না, আসলে তোমরা আসার আগে ছেলে আমাকে তোমার জন্মদিনের তারিখটা বলে দিয়েছিল। তাই ভাবলাম তোমাকে একটু রান্না করে খাওয়াই।'
শম্পা একটু মুচকি হেঁসে বলল, 'ঠিক আছে, আমি তাহলে রান্নাতে একটু সাহায্য করি।'
'না, না আজ তোমার জন্মদিন, তোমাকে কিছু করতে হবে না।'
এরপর গল্প করতে করতে সকালের জলখাবারের পর্ব মিটল। রমাদেবী মিনতিকেও একটু পায়েস মুখে দিতে বললেন। মিনতি মাথা নেড়ে রান্নাঘরে ঢুকে গেল।

রবিবারের সকালটা চারজনেরই খুব আনন্দে কাটলো। দক্ষিণ কলকাতায় তিনতলা বাড়িটা খুব পরিপাটী করে সাজানো। বাড়ির পিছনদিকে একটা ছোট্ট ফুলের বাগানও আছে। রমাদেবীই সেই বাগানের পরিচর্যা করেন। বাড়িটা দেখলেই মনে হয়, এককালে দুজনেই খুব সৌখীন ছিলেন। সেদিন দুপুরবেলা খেতে খেতে চললো জমিয়ে গল্প। এতগুলো বছরের জমা গল্প মনে হচ্ছে যেন এক ঘন্টায় শেষ করতে হবে।
খাওয়াদাওয়া সেরে সুদেববাবু আর রমাদেবী বসার ঘরে চলে গেলেন। রমাদেবীর হাঁটুদুটো বড়ই ব্যাথা দিচ্ছে আজকাল। আর কোমরটাও ইদানিং একটু বেশী বিগড়েছে। তাই দুপুরে খাওয়ার পর তিনি ভেবেছিলেন একটু শুয়ে পড়বেন, তাই শোবার ঘরে ঢুকে বিছানায় গা এলিয়ে দিলেন। হঠাৎই তাঁর মনে হলো পায়ে কে যেন হাত দিয়েছে।
শম্পা বলে উঠল, 'আসুন, একটু টিপে দিই, পায়ে ব্যাথা করছে তো? সারাদিন এতো খাটাখাটুনি করেছেন, ব্যাথা তো হবেই! 'রমাদেবী চমকে উঠে বললেন, 'আরে না, না ও কিছু না, ছাড় তো, এস দুজনে গল্প করি। গল্প করতে করতে দুপুর গড়িয়ে যে বিকেল হয়ে গেল সে খেয়াল তাদের নেই। এই কদিনে এরা যেন সুদেববাবু আর রমাদেবীর একঘেয়ে জীবনটাই পাল্টে দিয়েছে।

সন্ধ্যে হয়ে গেল। সময় যেন দ্রুতগতিতে ছুটছে। আগে তো সময় কাটতেই চাইতো না। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে রমাদেবী বলে উঠলেন,
'এ কি, রাত আটটা বাজে?'
'হ্যাঁ,' ঘরে ঢুকে সায়ন বললো, 'বাবা আর শম্পা তো তোমার জন্য অপেক্ষা করছে। খেতে চলো।'
বাড়ীর কাজের মাসিকে ডেকে রমাদেবী বললেন, 'তুমি ওদের খেতে দিয়ে দাও। আমি আর আজ রাতে কিছু খাবো না। পেটটা বড্ড ভারী ভারী লাগছে।'
সেদিন রাতে সবাই খুব কম খেলো। পরের দিন ওরা দুজনে চলে যাবে। ছুটি ফুরিয়ে গেছে। সেজন্য সবারই মনটা একটু খারাপ হয়ে গেছে। বিশেষতঃ সায়নের মা, বাবার মন খুবই ভারাক্রান্ত। কাল থেকে আবার বাড়ী ফাঁকা হয়ে যাবে। আবার সেই গতানুগতিক জীবন শুরু হয়ে যাবে।

ওদের এবার বিদায় নেবার পালা। হঠাৎই রমাদেবী সায়নের হাতদুটো ধরে বললেন, 'তোরা দুজনে এখানেই ফিরে আয় না বাবা! 'পরমুহূর্তেই নিজেকে সামলে নিলেন। এরপর তিনি শম্পাকে একটা সোনার আংটি দিয়ে বললেন, 'এটা আমি তোমাকে উপহার দিলাম, নাও।'
শম্পা প্রথমে একটু ইতস্ততঃ করে থমকে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর অনেকবার বলার পর উপহারটি নিতে বাধ্য হল। নইলে রমাদেবী হয়তো দুঃখ পাবেন এই ভেবেই শম্পা হাত বাড়িয়ে ওটা নিল। রমাদেবী বোধ হয় ধরেই নিয়েছিলেন যে এই মেয়েই ওনার পুত্রবধূ হবেন। তাই কি উপহারটা দিলেন? সায়নের ব্যাপারটা যে ঠিক পছন্দ হয় নি সেটা ওর মুখ দেখেই বোঝা গেছিল। এদিকে বাইরে গাড়ি এসে দাঁড়িয়ে আছে। ওরা দুজনে কিছুক্ষণের জন্য একবার ভেতর থেকে ঘুরে এসে শেষপর্য্যন্ত রওনা দিল ।
আবার কবে আসবে কে জানে ?

এরপর সুদেববাবু বসার ঘরে চলে গেলেন। একটু পরেই ঘরের বাইরে এসে স্ত্রীকে ডেকে বললেন, 'দেখো, ওদের কান্ড! তোমার উপহারটা টেবিলে রেখে চলে গেছে। শুধু তাই নয়, এর সঙ্গে একটা চিঠিও লিখে রেখেছে।' রমাদেবী অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন। শুধু জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেন'? ওনার স্বামী ওনাকে শান্ত হয়ে বসতে বলে চিঠিটা পড়ে শোনালেন।

শ্রী চরণেষু বাবা ও মা ,
তোমাদের দেওয়া উপহারটা এখন তোমাদের কাছে রেখে দিও। আমি শম্পাকে এখন নিতে বারণ করেছি। ক্ষমা করে দিও। আমি যখন বিয়ে করে ওকে নিয়ে আসব তখন উপহারটা দিও। ফিরে গিয়ে রেজিস্ট্রি ম্যারেজ করবো সেটাই আমাদের ইচ্ছে। আশা করি, শম্পাকে তোমাদের পছন্দ হয়েছে। ও এবারে আসতে চায় নি। আমি একপ্রকার জোর করে নিয়ে এসেছি। তোমাদের দুজনকেই শম্পার খুব ভালো লেগেছে। তোমরা ভালো থেকো। প্রণাম নিও। ইতি- সায়ন

রমাদেবী খানিকক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন। কি বলবেন ভেবে পেলেন না । একটু পরে বললেন, 'মেয়েটি বড্ড ভাল। কদিনেই আমাদের কিরকম আপন করে নিয়েছিল, ছেলের পছন্দ আছে, বলতে হবে!'
এতদিন পর কাউকে যে মনে ধরেছে এই ভেবেই তিনি আশস্ত হলেন বলে মনে হচ্ছে। সুদেববাবুও ওনার কথা শুনে একটু ফিক করে হেসে বললেন, 'আমারও পছন্দ হয়েছে।'

এরপর আবার কবে দুটিতে মিলে আসবে, সেই দিনটার আশায় আমাদের থাকতে হবে। এই বলে সুদেববাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। এরপর প্রায় তিন চার বছর কেটে গেছে। এর মধ্যে অনেকবারই সায়নের সঙ্গে মার কথাবার্তা হয়েছে। কিন্তু বিয়ের ব্যাপারটা সবসময়েই এড়িয়ে গেছে। ওর মাও সেজন্য একটু চিন্তায় আছেন। কি যে হলো কিছুই বুঝতে পারছেন না। আর সুদেববাবু ওনাকে চিন্তা করতে বারণ করেন। যখন যেটা হবার ঠিক হবে, চিন্তা করে লাভ নেই, এটাই ওনার মত।

এবার হঠাৎই একদিন রাত্তিরে ছেলে ফোন করে বললো যে সে শীঘ্রই বিয়ে করছে এবং সেটা সে দেশে মানে কলকাতাতে এসেই করবে। তবে সে শম্পা নয়, তার কলেজের বেস্ট ফ্রেন্ড সুস্মিতা। আরও একটা সুখবর দিল যে সে নাকি বিদেশের চাকরি ছেড়ে দেবে। কারণ, বেঙ্গালুরুতে অনেক মাইনের একটা চাকরির অফার পেয়েছে। সুস্মিতাও বেঙ্গালুরুতেই চাকরি করে। শম্পার বাবা, মা মেয়ের জন্য অনেকদিন আগেই অন্য পাত্র দেখে রেখেছেন বলে সায়নের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে আপত্তি জানিয়েছেন। ফেসবুক থেকে সুস্মিতার খোঁজ পেয়ে সে নতুন করে আবার বিয়ের কথা ভাবছে। এইসব শুনে ওর মা তো আনন্দে আটখানা। বিশেষতঃ ছেলে ইন্ডিয়াতে ফিরছে। প্রথমদিকে একটু হতাশ হয়েছিলেন, কারণ শম্পাকে খুব পছন্দ হয়েছিল। যাই হোক, এখন আবার আশায় আশায় দিন গুনতে হবে, কবে সে এসে বিয়ের পর্ব মেটাবে। তাহলে ওর বাবা, মাও চিন্তামুক্ত হন।
শুধু ওনাদের একটাই প্রশ্ন- সুস্মিতার মা, বাবা আবার মেয়ের জন্য কোনো পাত্র ঠিক করে রাখেন নি তো?

বিচার চাই

মানস দে

কোন সুলোচনা চুমু খাওয়ার ভঙ্গিতে লিপসিঙ্ক এ শাঁখ বাজিয়ে বলছেন – উই ওয়ান্ট জাস্টিস। কোন দিদি হাপুস নয়নে জল রচনা করছেন মসৃন গালের ওপর আর বলছেন – বিচার চাই। বিশ্বাস করুন, এই চোখের জল রচনার পেছনে কিন্তু কোন ধোঁয়া নেই, ধোঁয়াশা নেই, ধোঁকাও নেই। কোন কবির জাগ্রত সুবোধ বিবেক কবিতা লিখছে – রাতের দখল নিক মেয়েরা। এখন হয়তো কোন চিত্রকর কোন নগ্ন কাকের ছিন্নভিন্ন দেহের ছবি এঁকে ওপরে লিখছেন – শেষ বিচারের আশায়। হয়তো কোন প্রতিবাদী সুরকার এখন গান বেঁধে চলেছেন পুজোর মঞ্চে গাইবেন বলে – প্রথমত আমি বিচার চাই, দ্বিতীয়ত আমি বিচার চাই, তৃতীয়ত আমি বিচার চাই। কেউ স্টেপ মিস করে আউট হয়ে দুর্গন্ধ ছড়িয়ে বলছেন – বিচ্ছিন্ন ঘটনা। যদিও পরের ইনিংসে বলছেন – এমন বিচার হোক যাতে ভবিষ্যতে এমন ঘটনা না ঘটে। সব বুদ্ধিজীবীরা একজোট হয়ে বলছেন দেখ এবার কিন্তু আমরা পথে নেমেছি। আমরাও বলছি বিচার চাই। এতক্ষণ রাজা চটি পরে মুদিখানার দোকান থেকে সব দেখছিলেন। তিনিও বেরিয়ে এসে বললেন – নির্যাতিতার বিচার চাই। সব পারিষদ গর্জে উঠল – বিচার চাই। বিচার চাই। পরে ভুল শুধরে বললেন – ধর্ষিতার বিচার চাই। সব পারিষদ গর্জে উঠল – বিচার চাই। বিচার চাই.....

গিনিপিগ

পাপিয়া দাসগুপ্ত

গিনিপিগ গিনিপিগ, আমি এক গিনিপিগ,
নেই কোনো ডাক্তার, তোতন যে নাম তার।
শুনছিনা শুনবনা, কারো কথা মানবোনা,
মুখে কিছু বলবোনা, রাগারাগি করবোনা।
সদা মোর হাসি মুখ, মনে নেই কোনোই দুখ?
তবে যদি জানতাম, ঠিক মনে রাখতাম।
গিনিপিগ আর ডাক্তার, এক নয় নাম তার,
আমার বিচার তাই আমিই করি,
সময় হলে দুনিয়াটা উল্টেও দিতে পারি।
খাবার না খেয়ে শুধু জিম জিম জিম,
দিনের আহার মানে একটা আপেল আর একটা সেদ্ধ ডিম্।
ভালোই তো চলছিল, ওজন ও তো কমছিল,
কিন্তু এ গিনিপিগ, বুঝলোনা কোনটা ঠিক?
দিনের শেষে ঘুমের দেশে দিলো সে যে পাড়ি,
যা খোয়া গেল, চলেই গেল,
তা আর কেমনে ভুলতে পারি?

এক চতুর্থাংশ (১/৪)

পাপিয়া দাসগুপ্ত

এসেছিলে যাবে বলে,
তাড়াহুড়োর ছলে কলে,
আমার গর্ভে যদি এলে,
এক চতুর্থাংশেই চলে গেলে?
কিসের তাড়া তোমার ছিলো?
প্রারম্ভেতেই দিন ফুরালো।
বুঝলেনা মোর মনের ব্যাথা,
দিলে পাড়ি অন্য কোথা।
হয়তো তুমি আছো সুখে,
সদা হাস্য মিষ্টি মুখে?
আমার যে আর দিন কাটেনা,
আকুল প্রাণে কতো ভাবনা!
কত স্বপ্ন দেখেছিলাম,
হাহুতাশে জড়িয়ে গেলাম।
এক জীবনের শত বর্ষ,
আসে কত নব বর্ষ।
তোমার জীবন পেলো শুধু,
এক শতকের চতুর্থাংশ।

সাগর পারের গল্প

মোনামী পাল রায়

পতিদেবের চাকরীর কল্যাণে আটমাস ব্যাপী অস্ট্রেলিয়ার প্রবাস জীবনটিকে যদি ভ্রমণকাহিনী হিসেবে লিখি তবে মনে হয় দুটির ক্ষেত্রেই যথেষ্ট অবিচার করা হবে। প্রবাস যেমন অনেকটাই অধরা রয়ে যাবে তেমনি ভ্রমণ কাহিনীটিও দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হওয়ার দোষে দুষ্ট হবে। তবুও নতুন দেশের নানাবিধ অভিজ্ঞতা সকলের সাথে ভাগ করে তাকে বহুগুণে আবার উপভোগ করার তীব্র আকাঙ্ক্ষায় আয়াসে সসীম আয়তনের মধ্যে ছোট ছোট কিছু অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করার একটি ছোট প্রয়াস করলাম মাত্র।

১ সিডনীর দুর্গাপূজা

২০১২ সালে মহালয়ার ঠিক তিনদিন আগে আমরা যুগলে আমাদের পনেরো মাসের একরত্তি ছেলেকে নিয়ে পৌঁছোই অস্ট্রেলিয়ার সিডনী শহরে। জীবনে প্রথম সুদূর পরবাস যাপনের প্রাথমিক উত্তেজনার থেকেও আপনজনদের থেকে দূরে আসার কষ্ট অনেক বেশী অনুভব করেছিলাম হৃদয়ে। এয়ারপোর্টে দাঁড়িয়ে থাকা অশ্রুসজল একান্ত আপন চোখের সারি হৃদয়ের তন্ত্রীতে পূজোর আগেই কেমন জানি বিসর্জনের বিষাদের সুর বাজিয়ে তুলছিল অনবরত। যাই হোক্। সার্ভিস অ্যাপার্টমেন্টে পৌঁছে, সবকিছু গুছিয়ে, বরের অফিস, লোকাল গ্রসারি, ডিপার্টমেন্টাল স্টোর, ফোনের নতুন সিম, ইন্টারনেট — এসব সামলাতে সামলাতে ঝড়ের বেগে দুটো দিন কেটে গেল। এরমধ্যেই আবার আমাদের অ্যাপার্টমেন্টের রুম চেন্জ করতে হলো। এবং যথারীতি আমার বর যখন অফিসে তখন দুইজন পলিনেশিয়ান হাউস কিপিং পারসোনাল্স দূর্বোধ্য অ্যাকসেন্টে আমাকে জানালো–"ই হাফেতা সিফত তু অ্যা তু বেদরো রু অন গাউন্দফো"। ("you have to shift to a two bedroom room on ground floor")। প্রাথমিক ধাক্কা টা সামলাতে বলাই বাহুল্য মোটামুটি মিনিট পাঁচেক তো লেগেইছিল, তারপরই ছুটে ফোন করলাম আমার সবেধন নীলমণিটিকে। অফিসের ব্যস্ত সময়ে ফোন আসায় চূড়ান্ত বিরক্ত হয়ে উনি সব শুনে টুনে বললেন – তো শিফ্ট করেই নাওনা। ওয়ানের বদলে টু রুম দিচ্ছে। চলে যাও।"
"আরে আমি একা এত জিনিস নিয়ে বাচ্চা নিয়ে কীভাবে ম্যানেজ করব?"
"আহা একা কোথায়? দুজন তো এসেছে বললে।" "
"ওদের কথা বুঝিনা"।
"কি যে বলো! তুমি শিক্ষিত মেয়ে। দিব্যি তো বুঝলে। তুমি পেরে যাবে।" মাথা তেলে বেগুনে জ্বলে উঠল। দুম করে ফোন কেটে তাদের দিকে তাকিয়ে বললাম – ওকে লেটস প্যাক অ্যান্ড গো। ওরা বোধহয় 'প্যাক'— কথাটা আশা করতে পারেনি। বার দুয়েক নরুন চেরা চোখে বিরক্তি ও মুখে হাসি ফুটিয়ে প্যাক শব্দটি উচ্চারণ করল। এবং পরবর্তী আধ ঘন্টার মধ্যে বিজয়িনী বঙ্গ নারী লটবহর সমেত বাচ্চা কোলে বৃহদাকার একটি 'তু বেদরো 'তে এসে থিতু হলো। আমার নীলমণি টি আবহাওয়া যে অনুকূল নয় তা বুঝে বার চারেক কল করেছিলেন কিন্তু——— ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন।
পারিবারিক ঝড় ঝাপটা শেষ হলে আমি আমার সুটকেস থেকে বের করলাম মায়া জাদু কাঠিটি—- মহিষাসুর মর্দিনি সিডি। লুকিয়ে রাখলাম কাবার্ডে। আর ভোর চারটেতে উঠেই বাজিয়ে দিলাম —-
"আশ্বিনের শারদপ্রাতে বেজে উঠেছে আলোক মঞ্জীর;
ধরণীর বহিরাকাশে অন্তরিত মেঘমালা;
প্রকৃতির অন্তরাকাশে জাগরিত জ্যোতির্ময়ী জগন্মাতার আগমন বার্তা।"
সোফায় বসে, ধূমায়িত চায়ের কাপ হাতে আমরা দুজন আপাত প্রবাসী বর বউ দেশ গণ্ডীর বেড়াজাল পেরিয়ে শারদীয়ার উৎসবে শামিল হলাম প্রতিবারের মতই।

এরপর শুরু হলো আমার ইন্টারনেটে সিডনীর দুর্গাপূজা সংক্রান্ত তথ্য অনুসন্ধান। গুগলবাবাজীর দাক্ষিণ্যে অতি সহজেই সমস্ত ডিটেল্স নিয়ে আমি তৈরী পূজোতে যাওয়ার জন্য। আমার বরের কয়েকজন সহকর্মী, যারা আমাদের সাথেই সিডনী গিয়েছিল, সকলে মিলে একটা বড় গাড়ী ভাড়া করে পাড়ি দিলাম সিডনী

সি বি ডি থেকে মাত্র পনেরো কিমি দূরে অবস্থিত কনকর্ড-এ। কনকর্ড হাইস্কুলে বেঙ্গলী অ্যাসোসিয়াশনের দুর্গাপূজা বেশ বড়ো করে বহুল আয়োজনেই অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। দুর্গাপ্রতিমা ও খুব সুন্দর। আমরা সপ্তমীর দিন রবিবার গিয়েছিলাম। পরদিন আর যাওয়া হবেনা। সোমবারের অফিস, তার ওপর সদ্য প্রজেক্ট নিয়ে আসা। সুতরাং পূজো আজকেই জমিয়ে এনজয় করতেই হবে। মাইকে পুরোহিতের মন্ত্রোচ্চারণ, শাড়ী ধুতি পরিহিত লোকজন, বাতাসে ভেসে আসা খিচুড়ির সুবাস —- এক্কেবারে ষোল আনা বাঙালীয়ানা। কিন্তু না। সুর যে বারেবারেই কেটে যাচ্ছিল। ধুতি শাড়ী পরিহিত বাঙালীরা যে মাতৃভাষা ত্যাগ করেছেন। তাদের সাজপোশাক বা চলন বাঙালী রীতি মেনে হলেও ওনারা খাঁটি প্রবাসী। বলনে বাংলা নৈব নৈব চ। এমনকী শুধুমাত্র নিজস্ব পরিমন্ডলের বাইরেও বুঝি "হাসতে তাদের মানা।" সুতরাং অপাঙ্‌ক্তেয়র মতো কিছুটা সময় নিজেরাই ঘোরাঘুরি করে ছবি তুলে সময় কাটালাম। প্রসাদ পেতে গেলে কী ই বা সিস্টেম, কখন ই বা পূজো— এসব আর কার থেকে জানব? অগত্যা কিছু খুচরো কাউন্টার থেকে সিঙারা, পাওভাজি কিনে আমরা বেরিয়ে পড়লাম। আমাদের গাড়িটা বিকেল অবধি বুক করা ছিল কিন্তু আমরা সময়ের অনেকটা আগেই বেড়িয়ে পড়েছিলাম তাই গাড়িতে বসেই প্ল্যান হয়ে গেল — চলো সবাই সিডনীর বিখ্যাত অপেরা হাউস দেখতে যাই। প্রথম প্রবাসের দুর্গাপূজার অভিজ্ঞতায় যে মালিন্য আমার মনে রেখাপাত করেছিল, তা অপেরা হাউসের শ্বেত শুভ্র স্নিগ্ধতায় অনেকটাই দূরীভূত হয়েছিল। তবে সেই গল্প অন্য কোনোদিন।

পুনশ্চ: সন্ধ্যেবেলা হোটেলে ঢোকার সময় রিসেপশনে বসে থাকা একটি ছেলে আমাদেরকে বলল "হ্যাপী দুর্গাপূজা"। আর আমাকে বলল - নাইস শাড়ী ম্যাম।" জানতে পারি ও প্রবাসী পাঞ্জাবী। নাম রিকি। জন্ম অস্ট্রেলিয়াতেই। সত্যি কী বিচিত্র এই জগৎ। কখন কোথায় আন্তরিকতার ডোরে আমরা বাধা পরে যাই তা কেউ জানে না। আত্মিক বন্ধনই আত্মিয়তার একমাত্র ভিত্তি প্রস্তর—- বর্ণ, ধর্ম, ভাষা, জাতি নির্বিশেষে সেখানে সকলের মিলনমেলা—- সেখানেই চির অধিষ্ঠিত প্রাণের ঠাকুর।

২ সুশি

প্রায় তিনমাস অতিবাহিত করলাম পৃথিবীর দক্ষিণ গোলার্ধে। ডিসেম্বরে হিমেল হাওয়ার পরিবর্তে গরমে বেশ গলদঘর্ম অবস্হা। আমাদের ফ্ল্যাটটি নয় তলার ওপরে। সিডনির বিখ্যাত পর্যটক কেন্দ্র ডার্লিং হারবারের পাশেই। তাই হারবারের দিক থেকে বয়ে আসা হাওয়া শরীর মন জুড়িয়ে দেয়। আমরা যেই অন্চলটিতে থাকি সেটির নাম চায়না টাউন। বেশ জনবহুল জমজমাট পরিবেশ। দুপা এগোলেই যেহেতু ডার্লিং হারবার তাই এখানে সারা বছরই পর্যটকদের ভীড় থাকে। পুরো লোকালয়টি জুড়েই চাইনিজ, জাপানীজ, কোরিয়ান রেস্টুরেন্টের ছড়াছড়ি। সাধারণত বিকেলের পর থেকেই মন মাতানো, প্রাণ ভোলানো সুখাদ্যের সুগন্ধে মন আমার খাইখাই করে ওঠে। দেশ কাল পাত্র ভেদে অবিচল অকৃত্রিম আমার হ্যাংলা স্বভাব "এস বসো আহারে"-এর জন্য আনচান করে ওঠে। কাজ কর্ম সংসার এমনকী একরত্তি ছেলে ভুলে ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে রোজ ই জিভের আগায় আসা লিটার লিটার জল গিলি। চোখের সামনে যেন দেখি নরুন -নয়না সুন্দরীরা কতো কী সুখাদ্য পরিবেশন করে চলেছে। নাহ্! আর সহ্য হলো না। বরটিকে সংগে নিয়ে সোজা হানা দিলাম আমাদের অ্যাপার্টমেন্ট লাগোয়া শিবুয়া নামের এক রেস্টুরেন্টে। মেনু কার্ডে প্রথমেই চোখে পড়ল বেকড় প্রণ সুশি রোল। উফ্! প্রাণ টা যেন সাথে সাথে বেড়াল হয়ে উঠল। দিলাম অর্ডার হাঁকিয়ে। মিনিট দশেকের মধ্যেই সুবাসিত ধূমায়িত খাদ্যদ্রব্যটি প্যাকেট বন্দী হয়ে আমার হস্তগত হল। বিশ্ব জয়ের হাসি ঠোঁটে ঝুলিয়ে বর, ছেলে ভুলে "তুললো ঝোলা, চললো ভোলা"—-- সোজা ডার্লিং হারবারে। উদ্দেশ্য ককল্ বে এর তীরে বসে এই স্বর্গীয় স্বাদ উপভোগ করা।

আমার বরটি খাবার বিষযে এক্কেবারে রক্ষণশীল। চেনা খাবারের বাইরে উনি যান না। তাই আমার হস্তলব্ধ প্যাকেটটির দিকে তার কোনো দৃষ্টি নেই। সে বরং ছেলেকে প্র্যামে বসিয়ে আকুল নয়নে বে এর দিকে তাকিয়ে রইল। কিংবা কে জানে স্বল্পবসনা শ্বেতাংগিনীদের ও দেখতে পারে। এইসব বালখিল্য বিষয়কে পাত্তা না দিয়ে আমি প্যাকেট খুললাম। গুণে দেখি পেল্লাই সাইজের ছয়টি রোল আর প্রত্যেকটির ওপর নধরকান্তি লালচে গোলাপি চিংড়ি নববধূর মত ব্রীড়াবনত ভংগীতে বসে রয়েছে। আর বিলম্ব নয়। দোকান থেকে দেওয়া চপস্টিক ছুঁড়ে ফেলে গোদা হাতের মোটা আঙুল দিয়ে একটি রোল

তুলে ব্রহ্মাণ্ডগ্রাসী হাঁ করে ঢুকিয়ে দিলাম মুখে। তারপর!!!! বিস্ফোরণ। মাথা থেকে পা পর্যন্ত সুনামি। চোখের মণি বাইরে বেরিয়ে এল, গোবদা কুকুরের মতো জিভ গেল ঝুলে। ঝাল বলে ঝাল। এমন নারকীয় ঝাল আমি জীবনে দেখিনি এমনকী শুনিওনি। তার ওপর এ যে কাঁচা মাছ। ওপরের চিংড়িটা শুধু বেক করা। বিকট গন্ধযুক্ত শাকপাতা দিয়ে পেঁচানো ভেতরে আঠা আঠা বোঁটকা ভাত সহযোগে আঁশটে কাঁচা মাছের রোল। তার ওপর রয়েছে দাবানল সম ঝাল! আমার অন্নপ্রাশনের ভাত উঠে এল। বিকট গলায় বর কে ডেকে বললাম আর খাব না। সুন্দরী দর্শনে বিঘ্ন ঘটায় কিংবা মূল্যবান খাদ্যবস্তুটির অপচয় হেতু উনি চূড়ান্ত বিরক্ত হয়ে বললেন- "আরো খাও চীনে জাপানী ছাঁইপাশ। যত সব ছোঁকছোঁকানি।" ব্যস্! আমার সব রাগ গিয়ে পড়ল আমার বরের উপরে। রাগের চোটে আরো দুটো সুশি তুলে গিলে ফেললাম। তারপর আর মনে নেই। নিজেতে ফিরলাম যখন তখন দেখি আমার দেড় বছরের ছেলে রসগোল্লার মতো চোখে আমাকে দেখছে এবং তার পিতৃদেবটি উধাও। ঝালের চোটে, রাগের ডাঁটে, নিদারুণ অভিমানে আমার বুক ভেঙে, চোখ ফেটে জল চলে এল। নাকের জল চোখের জল সামলে পাক্কা নায়িকাদের মতো পোস দিয়ে ছেলেকে বললাম— "তুই ছাড়া আমার আর কেউ নেই রে বাবা।" ছেলে কী বুঝলো কে জানে! নেতাজীর দিল্লী চলোর মতো আঙুল তুলে বললো - বাবা! গা যেন তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলো। এত বড়ো বেইমান! সারাটা দিন আমি প্রাণপাত করি আর তার এই পরিণাম! রেগেমেগে আরোকিছু বলতে যাচ্ছিলাম — কিন্তু চোখ পড়ল ছেলের আঙুল নির্দেশিত দিকে। দেখি তার বাবা দুটো আইসক্রীম হাতে আসছে। কাছে এসে একটা আমার হাতে দিয়ে আইসক্রীমের মতো গলিত গলায় বলল - "নাও এটা খাও।" হৃদয়ে কী অনাবিল শান্তি সুধার স্পর্শ এলো কী বলব। ডার্লিং হারবারে তখন অস্তায়মান সূর্যের লাল রঙের ছোঁয়া। সূর্য কি? আমার তো মনে হলো আকাশ মাটি জল — সারা বিশ্ব চরাচর ভালোবাসার রঙে রাঙিয়ে গেল।

পুনশ্চ: আচ্ছা তবে রোজ বিকেলে যে মন আনচান করা সুগন্ধ টা পাই সেটা তবে কী ? আমার কলকাতার বাড়ীর পাশের চীনে খাবারের দোকানের গন্ধটাই কী তবে হৃদয়ে বহন করে এনেছি এই পরবাসে?

৩ ইংল্যান্ড পর্ব

ইংল্যান্ড নামটির সাথে মনে হয় আমার খুব একটা সখ্যতা কখনো ই ছিল না। আমার দাদু স্বদেশী ব্যক্তি ছিলেন এবং আমার জীবনে ওনার প্রভাব খুবই বেশি। দাদুর মুখে ব্রিটিশ বিরোধিতার গল্প শুনে শুনে আমিও ইংল্যান্ড দেশটিকে কখনোই আমার পছন্দের তালিকায় রাখিনি। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে এবং বয়সের পরিণতমনস্কতায় মানুষের চিন্তাভাবনার স্তরে পরিবর্তন আসে। আমি ইংলিশ অনার্সের ছাত্রী। জলপাইগুড়ি- তেই পড়াশোনা। কলকাতার কলেজগুলো র মতো সুযোগ সুবিধা, সেমিনার, স্টুডেন্ট এক্সচেঞ্জ---এসব ব্যতিরেকেই আমাদের পড়াশোনা। কলেজের অধ্যাপক এবং যাদের কাছে বাড়িতে পড়তাম তাদের তত্বাবধানেই আমার সামনে ইংল্যান্ডের এক নতুন দিক উন্মোচিত হয়ে ওঠে----ইংলিশ সাহিত্য সম্ভার।

অস্বীকার করতে পারিনা যে দুশো বছর শোষণ ও শাসনের বিভীষিকাময় ইতিহাস সত্ত্বেও আমি ইংল্যান্ডের সাহিত্যকে ভীষণ ভাবে সম্মান করি এবং এই সুবিশাল সাহিত্য ভান্ডারে আমার পরম আপন উইলিয়াম ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ। ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের লুসি পোয়েমস্ (Lucy Poems), আমার কিশোরী মনকে ভীষণভাবে প্রভাবিত কেরছিল। বেদনা যে এতো বাঙ্ময়, এতো হৃদয় গ্রাহী হয়ে উঠতে পারে তা আমি ওনার রচনাতেই জানতে পারি। ওনার রচিত সলিটারি রীপার (The Solitary Reaper), ডাফোডিলস্ (Daffodils), টু দ্য স্কাইলার্ক (To The Skylark), ইম্মর্টালিটি ওড্স্ (Immortality Odes)। হৃদয়ের ক্যানভাসে কত ছবি আঁকে, কত কী ই না ভাবতে শেখায়। এই সব রচনার মধ্যে টিনটার্ন অ্যাবে (Tintern Abbey) আমার ভীষণ প্রিয়। সৌন্দর্য্য, প্রকৃতি এবং প্রকৃতির মধ্যে ঈশ্বরের অধিষ্ঠান--- পাঠককে নিয়ে যায় এক অনুপম মননশীল জগতে।

২০১৩ সাল থেকে প্রায় দেড় বছরের কিছু বেশি আমি বর বাচ্চা সহ ইংল্যান্ডে ছিলাম। ভ্রমণ প্রিয়

আমরা যুগলে দুই বছরের শিশু পুত্রটিকে নিয়ে ঠান্ডা ,ঝড় ,হাওয়া ,বৃষ্টি উপেক্ষা করে ঘুরে বেড়িয়েছি ইংল্যান্ডের নানা দ্রষ্টব্য স্থানে। এর মধ্যে শেক্সপিয়ারের গ্লোব থিয়েটার, ওয়েস্টমিনস্টার অ্যাবের পোয়েটস কর্ণারে রক্ষিত চসার, জন ড্রাইডেন, চার্লস্ ডিকেন্স, রবার্ট ব্রাউনিং, থমাস হার্ডির সমাধি আমাকে রোমাঞ্চিত করেছে। জন ডান, টি এস্ এলিওট, ফিলিপ সিডনি, পি বি শেলী --এদের পদধূলি ধন্য অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে দাঁড়িয়ে শিহরিত হয়েছি আবেগে। আবার শিশু সুলভ হৃদয়ে উপভোগ করেছি ২২১/বি বেকার স্ট্রীট (221/B Bekar Street) এ শার্লক হোমসের বসতবাড়ি বা মিউজিয়াম দেখার অভিজ্ঞতাটি।

মনে পড়ে এক মে মাসে আমরা ঘুরতে গিয়েছিলাম লেক ডিস্ট্রিক্ট-- ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের স্মৃতি বিজড়িত ,অপার্থিব সৌন্দর্য মণ্ডিত এক পাহাড়ি জনপদ।আপামর পাহাড় ঘেরা আদিগন্ত সবুজের গালিচা বিছানো এই স্থানে কম বেশি পনেরো ষোলটি লেক আছে। এর মধ্যে উইন্ডারমেয়ার, বাটারমেয়ার, গ্রাসমেয়ার, কনিস্টন ওয়াটার, ডেরওয়েন্ট ওয়াটার, আলস্ওয়াটার বিখ্যাত। ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের কালজয়ী ড্যাফোডিলস্ কবিতাটি আল্সওয়াটার লেকের ধারে প্রস্ফুটিত পুষ্পরাজির স্বর্গীয় প্রেক্ষাপটে লেখা। এই স্থানে দাঁড়িয়ে মনের মধ্যে সে এক অপূর্ব অনুভূতি-----বিস্ময়, আনন্দ, মোহ।

আমরা গিয়েছিলাম ডোভ কটেজ---উইলিয়াম ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের বসতবাড়ি। উনি এখানে দীর্ঘ আট বছর বাস করেছিলেন। তাঁর কিছু অমর রচনা যেমন ইম্মর্টালিটি ওডস্, ওডস্ টু ডিউটি, ড্যাফোডিলস্ এখানে ই রচিত। ডোভ কটেজ দর্শন আমার জীবনের এক অমূল্য স্মৃতি। মূখ্যত অপরিবর্তিত ই রয়েছে এই বাড়ির নকশা ,আসবাবপত্র, এমনকী ব্যবহৃত কিছু বাসনপত্র। সে সব ছুঁয়ে দেখা যায়---স্পর্শ টি ধরে রাখা যায় আজীবন।

সে বছরের ই শেষ দিকে ক্রীসমাসের ঠিক আগ দিয়ে আমরা গিয়েছিলাম ওয়েলস্ বেড়াতে। অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য এবং কীংবদন্তির পীঠস্থান হলো ওয়েলস্।কিং আর্থার ও তার লেজেন্ডারি নাইটস্ দের লীলাক্ষেত্র ছিল এই ওয়েলস্। আর্থার ও তার নাইটস্ দের বীর গাঁথার বেশ কয়েকটি আমাদের কলেজ ইউনিভার্সিটি তে পাঠ্য ছিল।
"স্যার গাওয়েন অ্যান্ড দ্য গ্রীন নাইট" , "স্যার ল্যান্সেলট", 'জেওফ্রি ওফ্ মনমাউথ' ---কলেজের ক্লাসরুম থেকে আমার চোখে র সামনে জীবন্ত হয়ে উঠেছিল।কী যে অসাধারণ সেই অভিজ্ঞতা। কেল্টিক স্থাপত্য শিল্পের ধ্বংসাবশেষের ওপর দাঁড়িয়ে সকালের সোনালী সূর্যের আলোর ছটায় চোখে যেন ঝলসে উঠল এক্সক্যালিবার----কিং আর্থারের তরোয়াল।

এরপর যাই আরেকটি অনবদ্য অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে টিনটার্ন অ্যাবে তে। টিনটার্ন নামের ছোট্ট একটি উপত্যকা গ্রামে রয়েছে দ্বাদশ শতকে নির্মিত এই ক্রিশ্চান মঠটি।বর্তমানে বেশ কিছুটা ধ্বংস প্রাপ্ত হলেও এর বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ কাঠামো টি কিন্তু স্বকীয় সম্ভ্রমে দন্ডায়মান। ওয়েই নদীর তীরে অপূর্ব প্রাকৃতিক পরিমন্ডলে অবস্থিত লাল স্যান্ড স্টোনে নির্মিত বহুলাংশে ধ্বংস প্রাপ্ত এই মঠটি যেন অধিবাস্তবিকতার মূর্ত প্রতীক।আমরা যখন অ্যাবে তে পৌঁছোই, তখন পড়ন্ত বিকেল।হাঁড় কাঁপানো শীতের ওই অপরাহ্ন বেলায় মোটামুটি নির্জন টিনটার্ন অ্যাবে মনের মধ্যে এক অদ্ভুত আবেগের ঝড় তোলে। অ্যাবে র ভেতরে ঢুকে আমার মনে হলো সময় যেন থমকে গেছে এখানে।ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ এর টিনটার্ন অ্যাবে ও বর্তমান টিনটার্ন অ্যাবে অপিরবর্তিত, অক্ষয়, অমর। মনের মধ্যে উদয় হলো সেই সব কালজয়ী পংক্তি---".....sensation sweet /Felt in the blood, and felt along the heart/And passing even into my purer mind." ---------নিজের অজান্তেই কখন যেন চোখে জল চলে এল। মনের মধ্যে ভেসে উঠল আমাদের কে কে বি(K.K.B) স্যারের উদাত্ত কন্ঠস্বর, চট্টরাজ স্যারের স্নেহের স্পর্শ , ডি কে(D.K) স্যার, বি ডি (B.D) স্যারের সশব্দ পদচারণ আমাদের সাতচল্লিশ নম্বরের অনার্সের ঘরে। এমনি কত পড়ন্ত শীতের বিকেলে অনার্সের শেষ ক্লাসে বসে থাকা উৎসাহী, উৎকর্ণ একদল কিশোর কিশোরীর আগ্রহী মনোযোগ, তাদের কলকুজন, অধ্যাপকদের আনাগোনা, নতুন সাহিত্য সম্ভারের সন্ধান -------দেশ কাল গন্ডীর সীমানা পেরিয়ে এই টিনটার্ন অ্যাবে র কোনো এক খিলানে গাঁথা রয়ে গেছে। এখানে হারায় না কিছুই, সময়কে খুঁজে পাওয়া যায়, তাকে যেন ছোঁয়া যায়, নতুন ভাবে নতুন

করে চেনা যায়। উইলিয়াম ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কালজয়ী রচনার মধ্যে দিয়ে, তাঁর প্রায় দুই শতাধিক পরে, তাঁর গুণমুগ্ধ এক পাঠিকা আমি খুঁজে পেলাম, ফিরে পেলাম, পড়ন্ত বিকেলের অস্তরাগে রঞ্জিত টিনটার্ন অ্যাবের ধ্বংসাবশেষে আবার তাকে রেখে এলাম-----অন্য কারোর জন্য।

Pakhi shob kore rob
Arunangshu Saha (6 yrs)

স্মৃতিচারন – কারিগরী বিদ্যালয়ে প্রবেশ

পার্থ মুখার্জী

তখন ১৯৫২ সাল - ঝাড়গ্রামে কুমুদকুমারী বিদ্যালয়ের ক্লাস এইটে পড়ি। বিকেল ৪টে নাগাদ স্কুল থেকে ফিরে দেখি বাইরের ঘরে বাবা চারজন যুবকের সঙ্গে কিসব আলোচনা করছেন। বাবা তখন ঝাড়গ্রাম কৃষি কলেজে রসায়নবিদ্যার অধ্যাপক এবং হষ্টেল সুপারিন্টেডেন্ট। বাবার বেয়ারা ঋতেনদাকে জিগ্যেস করে জানলাম এঁরা ইন্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্র। এসেছেন গ্রাম বিদ্যুতায়নের সমীক্ষা করতে। বয়েসে এঁরা আমার থেকে ৭/৮ বছরে বড় - মানে আমার দাদারই বয়সী - তাই প্রায় নির্ভয়েই আলাপ চলল। এঁদেরই একজন বিশ্বনাথ চ্যাটার্জ্জী ইন্জিনিয়ারিং - বিশেষ ইলেক্ট্রিকাল এবং ইলেক্ট্রনিক্স - সম্বন্ধে সব কর্মকুশলতার কথা বললেন। আমি ত' স্তম্ভিত এবং উৎসাহিত হয়ে শুনলাম।

দু'বছর বাদে যখন সিউড়ি হাইস্কুলে ভর্তি হলাম, আকস্মিকভাবে সহপাঠী এবং প্রতিবেশী সোমনাথের দাদা জেনে বিশ্বনাথদার সঙ্গে অন্তঃরঙ্গতা আরও দৃঢ় হয়। এদিকে লাগোয়া পাশের বাড়ীতে থাকতেন বিমল সেনের তিনভাই। বিমলদা তখন ময়ুরাক্ষী প্রজেক্টে কাজ করতেন - পরে তিনি বি ই কলেজে অধ্যাপনায় যোগ দেন। বিমলদা তখন প্রতি রবিবার কোয়ার্টার ছেড়ে ভাইদের সঙ্গে সমস্ত দিন কাটাতেন। আমাদের সঙ্গে সম্পর্ক প্রায় পারিবারিক পর্য্যায়ে পৌঁছে যায়। বাবা বিমলদার ভাইদের কলেজের শিক্ষক - প্রায় লোকাল গার্জেনের সমতুল। বিমলদা এবং বিশ্বনাথদার সহায়তা ও উৎসাহেই আমি অ্যাডমিশন টেষ্টে উত্তীর্ণ হয়েছি।

১৯৫৭ সালের জুন মাস। চিঠি পেলাম আমাকে বি.ই. কলেজের অ্যাপটিচিউড টেষ্ট এবং অ্যাডমিশন ইন্টারভিউ দিতে হবে। দাদুকে জিগ্যেস করলাম - বললেন সেখানে আমাকে বলতে হবে কেন আমি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি হতে চাই, কি শিখব সেখানে। ঠাম্মা কপালে দইএর ফোঁটা দিলেন, দাদু সঙ্গে করে বাগবাজারের মোড়ে ১১এ বাসে তুলে দিলেন। হাওড়া স্টেশনে ৫৫ বাসে চেপে ফার্স্ট গেটে নামলাম। কলেজে ঢুকে দেখি আরও কয়েকজন নিজেদের মধ্যে কিসব আলোচনা করছে। আমি ত' মফঃস্বলের ছেলে - ওখানে কল্কিই পেলাম না।

অল্পক্ষণ বাদে আমার ডাক পড়ল। ঘরে ঢুকে দেখি লম্বা টেবিলের এক প্রান্তে তিনটি চেয়ারে তিনজন আর দু'পাশে আরও তিনজন করে ছ'জন বসে আছেন। টেবিলের অন্য প্রান্তের চেয়ারে বসতে বললেন। উল্টোদিকের মধ্যের চেয়ারে প্রিন্সিপাল অতুল রায় নিজের

পরিচয় দিলেন। একে একে বাকি আটজনই নিজেদের পরিচয় দিলেন - প্রত্যেকেই ডিপার্টমেন্ট হেড। একমাত্র বরদা চ্যাটার্জ্জীই আমার পরিচিত - বাবার সহপাঠী বলে আগেই সায়েন্স কলেজে দেখেছি।

আরম্ভ হ'ল প্রশ্নোত্তরের পালা। এক এক জন এক একটি প্রশ্ন করলেন। যদিও কথোপকথন ইংরাজীতে হয়েছিল, বাংলায় তর্জমা করলাম।

তুমি ত' টালায় থাক। এখানে এলে কি ভাবে?

আজ্ঞে হ্যাঁ, আমর বাড়ী টালায়। বাগবাজার থেকে ১১এ বাসে হাওড়া ষ্টেশন, তারপর ৫৫ বাসে ফার্স্ট গেট।

তোমাকে তাহলে ত' গঙ্গা পারাপার করতে হয়েছে।

আজ্ঞে হ্যাঁ, হাওড়া ব্রীজ পেরিয়েই ষ্টেশনে বাস বদলাতে হয়েছে।

আচ্ছা, হাওড়া ব্রীজের কি রং বল ত'।

আজ্ঞে, অ্যালুমিনিয়াম রং।

তাহলে ব্রীজটা কি অ্যালুমিনিয়ামের?

আজ্ঞে না, অ্যালুমিনিয়ম নয়, ষ্টিল দিয়ে বানান। তাতে' অ্যালুমিনিয়াম রং লাগান হয়েছে যাতে মর্চে না ধরে।

তুমি নিশ্চয় ব্রীজটা ষ্টিলের, অ্যালুমিনিয়ামের নয়।

আজ্ঞে না, আমি নিশ্চিত নই।

কেন নিশ্চিত নয়?

আজ্ঞে, আমি ত' এখনও ইঞ্জিনিয়র হই নি।

সবশেষে অতুল রায় প্রশ্ন করলেন

তোমার দরখাস্তে প্রথম পছন্দ ইলেক্ট্রনিক্স কেটে সিভিল লেখা হয়েছে কেন?

আমার প্রাথমিক ইচ্ছা ছিল ইলেক্ট্রনিক্স। পরে বাবা এবং প্রফেসর বিমল সেন মহাশয়ের সঙ্গে আলোচনায় মত পরিবর্তন করি।

আমার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে অতুল রায় বললেন - তবে তাই হ'ক, সিভিল।

অবস্থিতি হ'ল ডাউনিং হল ওয়েষ্ট - ২৭ নম্বর ঘর। ডাউনিং ইষ্ট ও ওয়েষ্ট মিলিয়ে শতাধিক ছাত্রের জন্য দু'বেলা দুপুর এবং রাত্রের খাবার রান্না করত পুরুষোত্তম ও আরও দু'জন পাচক। আবাসিকরা প্রতি মাসে একজন মেস ম্যানেজার নির্বাচন করত। তাকে প্রত্যেকদিনের মেনু বলে দিতে হ'ত। সামান্যই আয়োজন - ভাত (রাত্রে ভাত ও রুটি), ডাল, নিরামিষ তরকারী আর মাছ (রাত্রে মাংস)। নিরামিশাষীদের জন্য দ্বিতীয় একটি তরকারী, দই

ও মিষ্টি থাকত। মাসে একদিন রাত্রে ভূরিভোজ - আমরা বলতাম বড়া খানা - হ'ত। সেদিন মুরগীর মাংসের বিভিন্ন রান্না ও কলকাতার কোন বড় দোকানের মিষ্টি থাকত। প্রত্যেককে পালা করে একদিন মেস ডিউটি দিতে হত। সেদিন ক্লাসে না গিয়ে হস্টেলে থেকে রান্নার তদারকি করতে হত। আর দিনের শেষে পেটি ক্যাশের হিসাব লিখতে হত। পুরুষোত্তম বাংলায় বলে যেত আর মেস ডিউটি কে রেজিস্টারে ইংরাজীতে লিখতে হত।দই মানে curd, মিষ্টি মানে sweets ইত্যাদি - সবাই জানে। প্রথম হোঁচট খেলাম ঘুঁটেতে। মাথা চুলকোচ্ছি ঘুঁটের ইংরাজী ত' জানা নেই। পুরুষোত্তমই উদ্ধার করল। বলল 'লিখুন cow dung cake'।

সে সময়ে সিনিয়র স্টুডেন্টরা একটি রাত্রে বিভিন্ন ভাবে নবাগতদের বিব্রত করতেন। এটাকে বলা হ'ত র‍্যাগিং। সে'বছরই প্রথম ৪০০ জন ভর্তি হল, আগের বছরের দ্বিগুণ। তাই , দলে ভারি আমরা, পরের সপ্তাহে তার জবাব দিয়েছিলাম সিনিয়রদের র‍্যাগ করে। বিস্মিত ও বিরক্ত হয়ে সিনিয়ররা দ্বিতীয় বার র‍্যাগিং করবার পরিকল্পনা করতে লাগলে ব্যাপার আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে আশঙ্কায় অধ্যক্ষ অতুল রায় সিনিয়রদের সংযত করেন। মনে পড়ে ফ্রেশার্স গ্যাদারিঙে প্রথমে অধ্যক্ষ অতুল রায় বললেন, শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের চাবিকাঠি হল সততা, সংযম, অধ্যবসায় ও নিয়মনিষ্ঠা। আরও মনে পড়ে সব শেষে দেবীপ্রসাদ বসুমল্লিক (১৯৫৯ আর্কিটেকচার) কিশোর কুমারের গান 'মুন্না বড়া প্যারা'র সুরে গান ধরলেন - 'যত বাচ্চু বাছারা, মায়ের আঁচল ছাড়া। কেউ বা ছাড়ে গন্ধ দুধের, কেউ তারও বাড়া'। ব্যাস, এর পর থেকেই রেশারিশি অন্তর্হিত হল, স্থাপিত হল জীবনভোরের জন্য দাদা-ভাইয়ের সম্পর্ক।

বার্ষিক রিইয়ুনিয়ন হত সেন হলের সামনে মাঠে মেরাপ বেঁধে। সন্ধ্যে ৭টা থেকে রাত ১০টা পর্য্যন্ত বর্তমান ছাত্ররা গান করতেন। সেখানেই শুনেছিলাম রোহিনীলাল মুনিচক্রবর্তীদার (১৯৫৯ আর্কিটেকচার) স্বকৃত পরিমার্জিত তানপুরা - একটি বাঁশেতে চারটি তার লাগান, সবাই আদর করে বলত বাঁশপুরা - বাজিয়ে গান করলেন। তারপর বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞরা পুরো রাত গান-বাজনায় মাতিয়ে দিতেন। তাঁদের আপ্যায়ন ও রেওয়াজ ইত্যাদি হত সেন হলের কমনরুম। সেখানেই দেখা হ'ল সরোদিয়া শ্যাম গাঙ্গুলীর সঙ্গে। তিনি বাবার খুবই অন্তরঙ্গ বন্ধু, এক সময় টালা পাড়ায় থাকতেন। তিনি আমাকে দেখে যেন হাতে চাঁদ পেলেন। বললেন 'দেখ ত' বাবা, আমার মন মতন পান (মানে শুধু মুস্কি পাতি জর্দ্দা আর সুপুরী থাকবে) যোগাড় করতে পারিস কি না।' রাত দেড়টার সময়ে পানের দোকান খুলিয়ে পান নিয়ে এলাম। এত খুশী হয়েছিলেন যে পরের দিন সকালেই যোধপুর পার্ক থেকে টালায় গিয়ে কানাইদাকে (আমার বাবা) খবরটা দিয়েছিলেন।

রিইয়ুনিয়নের আর একটি আকর্ষণ ছিল থিয়েটার। নাট্যপ্রেমী প্রাক্তনী ও বর্তমানীরা মিলে অভিনয় করতেন। পরিচালনা করতেন কামারশালার প্রধান অশোক ভঞ্জ। সেকালে ত' ছাত্রী বিশেষ থাকতেন না। তাই, পুরুষ অভিনেতারাই শাড়ী জড়িয়ে নারী চরিত্রে অভিনয় করতেন। একমাস ধরে মহড়া চলত সেন হলের কমনরুমে - প্রতি শনি ও রবিবার। রিইয়ুনিয়নের শেষ রাত্রে থিয়েটার মঞ্চস্থ হ'ত। ১৯৫৭ সালের নাটকে শেষ অঙ্কে এক মহিলাকে খুন করার দৃশ্য। অভিনেতা রিভলভার চালালেন - উইংসে চারি পটকা ফাটার কথা - হল না। অভিনেতা হাতের রিভলভার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলেন - মানে সময় দিলেন আবার চাবি পটকায় বারুদ ভরতে। দ্বিতীয়বার রিভলবার চালালেন - এবারেও পটকা ফাটল না। তখন তিনি হাতের রিভলভার উইংসের দিকে ছুঁড়ে দিলেন (জানালেন চাবি পটকার আর প্রয়োজন নেই) ও ডায়লগ দিলেন 'এখনকার গুলি বারুদেও ভেজাল'। গলা টিপে মহিলাকে যমালয়ে পাঠালেন। সমান পারদর্শিতায় মহিলা ছটফট করে চোখ উল্টে মরণের অভিনয় করলেন। পুরুষের ভূমিকায় অভিনেতা ছিলেন সুধীন্দ্র সরকার - পরবর্তীকালের বিখ্যাত নাট্যব্যাক্তিত্ব **বাদল সরকার**।

বি ই কলেজ জীবনের সমস্ত কথা লিখতে গেলে মহাভারতের আকার ধারণ করবে। কথিত আছে ব্যাসদেব বলেছিলেন আর গণেশঠাকুর লিপিবদ্ধ করেছিলেন। আমি এক সাধারণ অশীতিপর বৃদ্ধ - অত শক্তি, মেধা বা ধৈর্য্য - কোনটাই কোনদিনই ছিল না। তাই এইখানেই দাঁড়ি টানছি।

House
Andreas (Dev) Dutta (6 yrs)

আকাশপ্রদীপ

প্রদীপ্ত দে

লোকটা কিন্তু এমন ছিল না। মানে ধরুন, লোকটা কুকুর, বেড়াল, পাখিদের পেছনে তাড়াও করত না, আবার তাদের যত্নআত্তি করা, বিস্কুট ছুঁড়ে ছুঁড়ে দেওয়া ওসবও করত না কোনো দিন। এক এক দিন, রাত করে অফিস থেকে ফিরতে হত। রাস্তার কুকুরগুলো প্রথম দু'একদিন চ্যাঁচানোর পর, ওর গায়ের গন্ধটা চিনে গেছিল। আর চ্যাঁচাত না। লোকটাও তাদের ভয় পায়নি কোনওদিন। তাদের পুষতেও যায়নি, হুররর হ্যাট করে খেদিয়েও দেয়নি। মাইন্ডসেট একেবারে নিউট্রাল ছিল যাকে বলে...
কিন্তু একবার, সেই যে বাইপাসের ওপর –
রাস্তাটা তখন তৈরি হচ্ছিল, ঘটনাটা ঘটেছিল।
চতুর্দিকে বালি সুরকি স্টোনচিপসের পাহাড়, বড় বড় গর্ত, রাস্তার ধারে পিচ গলানোর কুচকুচে কালো ড্রাম, পালোয়ানের মত গুড়গুড় করতে করতে যাচ্ছিল একটা রোড রোলার। রাস্তা খারাপ, লোক চলাচল তেমন ছিল না, কিন্তু রাস্তা তো ছিল! গাড়ির চাকায় চাকায় ধুলোয় ধুলো হয়ে থাকত চারদিক...
প্রকৃতি ডাকছিল কিছুক্ষণ থেকেই। ধুলোটা পার করে, বাইকটা রাস্তা থেকে নামিয়ে নিরিবিলি দেখে একটা ঝোপের পাশে লোকটাকে দাঁড়িয়ে পড়তে হয়েছিল। পুরুষরা ঐ সুবিধেটা নিয়েই থাকে, এ নিয়ে বিতর্ক করা বৃথা।
রাস্তার উল্টো দিকে একটা সাইকেলঅলা তার সাইকেল থামিয়ে মোবাইল কানে ঠেকিয়ে জোরে জোরে কথা বলতে হাতে ধরা সাইকেলটা হাঁটিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল..
কাজ সেরে উঠে লোকটা দেখতে পেয়েছিল, রাস্তার ওপর একটা কুকুরছানা পড়ে পড়ে হাত পা ছুঁড়ছে আর চিৎকার করছে। নিশ্চয় খেলতে খেলতে রাস্তার মধ্যে এসে পড়েছিল, কোনও জোরে যেতে চাওয়া গাড়ির চাকার নীচে পড়তে পড়তে বেঁচে গেছে! ধারেকাছে ওর মা, বাদবাকি ভাইবোনগুলো গেল কই কে'জানে! লোকটা খেয়াল করে দেখল, পাটকিলে রঙের নোংরা একটা কুকুরছানা। কেঁউকেঁউ করে খুব চিল্লাচ্ছে! পা ফা ভেঙেছে বোধহয়। ওটাকে অন্ততপক্ষে তুলে রাস্তার ধারে সরিয়ে দেওয়াই উচিৎ। চিকিৎসা করানোর কথা পরে ভাবা যাবে! কিন্তু কিছু একটা দিয়ে ওকে ধরতে হবে তো, বেকায়দায় ধরতে গেলে আঁচড়ে কামড়ে দেয় যদি..রাস্তার কুকুর...
গুড় গুড় করে রোড রোলারটা এগিয়ে আসছে। তার প্রকান্ড ভারী মোটা চাকা। পিছনে অমন আরও দুটো। লোকটা হাত দেখিয়ে তাকে থামতে ইশারা করল।
যাই হোক, কুকুরছানাটার একটা ব্যবস্থা .....
রোড রোলারটা এসে পড়েছে একদম কাছে, ড্রাইভারটা ওর ইশারা বোঝেনি! পড়ে থেকে হাত পা ছুঁড়তে থাকা কুকুরছানাটাকেও দেখেনি! লোকটা দেখল বিশাল মোটাসোটা ভারী সামনের চাকাটা সটান উঠে যাচ্ছে কুকুরছানাটার গায়ে, রুটির ওপর বেলনের মত করে...
অফিসে, পাড়ায়, এমনকি ফ্যামিলিতেও সবাই জানে লোকটা এমনিতে খুব শান্ত প্রকৃতির। কিন্তু সেদিন সেই মূহুর্তটায় ওর মাথার একটা তার বোধহয় ছিঁড়ে গেছিল! বিশাল গাড়িটার স্টিয়ারিং এ বসা বেচারা মত লোকটার জামার কলার ধরে ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে– মেরে ফেললে ওকে, তুমি ওকে মেরে ফেললে? !
হাত দেখিয়ে বললাম থামতে, অন্ধ নাকি তুমি, অ্যাঁ, অন্ধ? এত করে থামতে বললাম, চোখে দেখতে পাও না? জানোয়ার একটা! বাচ্চাটাকে মেরেই ফেললে? ....আরও কী কী সব বলে যাচ্ছিল, আফসোস, হতাশা, না পারার চিৎকারে ওর গলা চিরে যাচ্ছিল, পাগলের মত হাত পা ছুঁড়ে চিৎকার করছিল লোকটা.....
সাইকেলঅলা আর কোত্থেকে আরও দু'তিনজন রাস্তা পেরিয়ে ছুটে এসেছিল। রাস্তার ওপরে ঘটতে থাকা নাটকীয় পরিস্থিতিটা সামাল দিয়েছিল।
রোড রোলারের ড্রাইভার বেচারা লোকটা অবাঙালি। বেমক্কা ঝাঁকুনির চোটে থতমত খাচ্ছিল, চ্যাঁচামেচি কিচ্ছু বোঝেনি, কিন্তু গোলমাল থামলে, নিজেও দুঃখিত হয়েছিল। ওর গাড়ি থেকে নেমে এসেছিল।

জিভ বের করা, শক্তমত ছোট্ট ছোট্ট হাত পা ছড়ানো একটা খেলনার মত কুকুরছানাটার শরীরটা। হাতে করে তুলে রাস্তার ধারে জলের পাশে ঘাসের ওপর রেখে এসেছিল।
পাঁচ মিনিটের মধ্যেই পৃথিবী আবার স্বাভাবিক হয়ে গেছিল।
লোকটাও মাথা ঠান্ডা হওয়ার পরে ভেবে দেখেছিল, সামান্য একটা কুকুরছানা চাপা পড়া নিয়ে রাস্তায় উটকো ঝামেলা করা বোধহয় ওকে মানায় না !
ও যে পাড়ায় থাকে সেখানেও রাস্তার কুকুর বেড়াল, তাদের ছানাদের হামেশাই দেখতে পাওয়া যায়। বরাবরের মতই...
লোকটা মোটের ওপর আগের মতই আছে। এখনো প্রতি বছর কালীপূজো ফুরনো হেমন্তকালে, সন্ধেবেলায় ছাদের ওপর একটা ছোট্ট আলো জ্বালে। ওটা আকাশপ্রদীপ। প্রিয়জন যারা চলে গেছে, অন্ধকারে তাদের পথ দেখানোর জন্যে গভীর বিশ্বাসে আর ভালোবাসায় যে আলো জ্বালে পৃথিবীর মানুষ, সেই আলো!
ঠাকুমা বলত, 'নাতি, স্বগগে দেবে বাতি'। ঠাকুমা স্বগগের দিকে চলে গেছে আটাশ বছর আগে।
মৃতদের পৃথিবীতে সময় কীভাবে গোণে, জীবিত'রা তা কোনও দিন জানবে না। বছরের একটি রাতে, আলো জ্বালানো চলেছে সেই চলে যাওয়ার দিনটি থেকে, সেই'ই আকাশপ্রদীপ।
বাইপাসের রাস্তা এখন ঝাঁ চকচকে। লোকটা আগের মতই এখনো মোটেই কুকুর পোষে না। তবে আজকাল একবেলার একটুখানি ভাত, বাড়িতে মাংস হলে তার কয়েক টুকরো, একটু হাড়গোড় – রাস্তার কুকুরগুলোর জন্যে আলাদা করে রাখে। ওদের দলের মধ্যে একটা পাটকিলে রঙের আছে।
ওর চোখগুলো যেন সেই বাইপাসের রাস্তার ধারে জলের পাশে রেখে আসা ছানাটার মতন! ঐরকম স্বচ্ছ, অমন ভেতরটা কাঁপিয়ে দেওয়া। পাটকিলেটা ওর ফেভারিট! তাই বলে ওর সঙ্গীসাথীদের অযত্ন হয় এমন নয়।
ওরা যখন খায়, চোখ বুজে আরাম করে হাড় চিবোয়,
ফটাফটাফটাফট আওয়াজ করে গা ঝাড়ে, গরমকালে যখন সিঁড়ির নীচে ছায়ায় চুপটি করে শুয়ে থাকে, খড়খড়ে সিমেন্টের মেঝেতে শুয়ে আহ্লাদে জিভ বের করে, যখন এঁকেবেঁকে হাত পা ছুঁড়ে পিঠ চুলকে নেয়,
লোকটা অকারণে, খুশি হয়ে যায়।

পুরুষ সিংহ

ঋত্বিক সেন

"আমার আজ একটা meeting আছে তুমি চা টা করে নিতে পারবে ? চা এর কৌটো বার করে রেখেছি।" কানে হেডফোন গুঁজতে গুঁজতে রিনি জিগেশ করলো।
"ওহ... আচ্ছা ঠিক আছে" বোধয় একটু ইতস্তত করে প্রভাত জানালো। প্রায় ৩ মাস হলো তাদের বিয়ে হয়েছে। কিন্তু এরকম দাবি রিনি আগে কখন করে নি। প্রভাতের কপালে চিন্তার রেখা। রান্নাঘরের দিকে তাকিয়ে প্রভাতের চিন্তা আরো গভীর হয়ে গেলো। তাঁদের "Love Marriage". কিন্তু বিয়ের মাত্র ৩ মাসের মধ্যেই কি ভালোবাসায় ফাটল ধরলো ? চা পাতার কৌটো হাথে নিয়ে প্রভাত ভাবতে লাগলো।
চা করা তো দুরে থাক, জীবনে এই প্রথম প্রভাত গ্যাস জ্বালাতে চলেছে। সে কখনো দেখেনি তার বাবাকে রান্না ঘরে পা দিতে। তাদের বাড়িতে ছেলেদের ঘরের কাজ করার প্রথা ছিল না। এমনকি বাড়ির মহিলাদের মতে রান্নাঘর টা পুরুষ সিংহ দেড় জায়গা নয়। ওটা মহিলাদের তত্ত্বাবধান এই থাকা ভালো। তাই প্রথামত রোধনশালার সাথে প্রভাতের সম্পর্ক ওই নামমাত্র।

প্রাণের প্রতি ভয় আর রিনির প্রতি রাগ এই দুই নিয়ে গ্যাসের knob তা ভালো করে পরীখ্যা করলো প্রভাত । On - Off - Sim তিন টা option দেখা যাচ্ছে। On -Off টা তো বোঝা গেলো, কিন্তু sim মানে কি ? Simulation ? Simple ? Sympathy ? না না Sympathy হতে পারে না। ওটা অন্য বানান। অগ্নিকাণ্ডের সম্ভাবনা এড়াতে গ্যাস জ্বালানোর উদ্যোগ তা বাতিল করে দিলো প্রভাত। সে পেশায় ইঞ্জিনিয়ার তাই একটা বিকল্প বার করে ফেলতেই পারবে। তাছাড়া তার মতে সারা বিশ্ব এখন electric এ শিফট করে যাচ্ছে। এই বাজারে গ্যাস জ্বালাতে না পারাটা এমন কিছু না। অতয়েব microwave এর দিকে focus shift করা হলো। "How to make tea in microwave" - Google করতেই বেশ কয়েক পাতা রেজাল্ট পাওয়া গেলো। কাপ এ জল নিয়ে ভিতরে রেখে দাও। একটা বোতাম টেপ। ব্যাস এক মিনিটের মধ্যে জল গরম। তারপর চা পাতা। নতুন উদ্যোগ এর উত্তেজনায় প্রভাত এক কাপ জল microwave এর ভিতরে রেখে দিয়েছে। দরজা বন্ধ করে ফেলেছে। এখুনি জল গরম হয়ে যাবে। আসন্ন বিশ্ব জয়ের আনন্দ প্রভাতের চোখে মুখে প্রকট। খালি একটা বোতাম টেপার অপেক্ষায়। কিন্তু এখানেই হলো বিপদ। কোন বোতাম ? ইন্টারনেট এ বললো "express" বোতাম তা টিপতে। কিন্তু এই microwave এ তো "এক্সপ্রেস" বলে কোনো বোতাম নেই।
Microwave এর model টা দিয়ে google করে জানা গেলো যে এই বিশেষ model এ জল গরম করার প্রথাটা একটু অন্যরকম। কোনো বড় ব্যাপার নয়। এক মিনিট পর microwave এর পি পি আওয়াজ সংকেত জানালো যুদ্ধ জয় হয়ে গেছে। চা পাতার কৌটো হাথেই ছিল। গরম জলে ভরা কাপ টা বার করে এবার চা বানাও হবে। চা এর রেসিপির বাকি অংশটা পরে ফেললো প্রভাত। "Put the tea bags in and steep them for ২ minutes". জাহ, আবার বিপদ। Tea bag এর অংশটা সে আগে লক্ষ্য করে নি। তার কাছে তো টি ব্যাগ নেই। খালি পাতা চা। Research করে জানা গেলো যে microwave এ পাতা চা বানানো একদমই সহজ নয়।

ইতিমধ্যে রিনির মিটিং শেষ হয়ে গেছে। রান্নাঘরে ঢুকে সে তো অবাক। সেই এখনো চা খাও নি ? আধ ঘন্টা ধরে কি করলে ? প্রভাতের রাগের পারা এবার মাত্রা ছাড়াচ্ছে। অনেক কষ্টে রাগ সংযম করে দাঁতে দাঁত চিপে বললো "গবেষণা করছিলাম". তাকে উপেখ্যা করে রিনা ইতিমধ্যে চা বানিয়ে ফেলেছে। "এই নাও চা। " প্রভাতের গালে আদর করে হাত তা বুলিয়ে মিষ্টি করে বললো "চা যে বানাতে পারো না, সেটা বললেই পারতে, আমি কি না করতাম ?".
নিমেষের মধ্যে প্রভাতের রাগ গলে জল। এমন মধুর বাণীর পর কি অরে অভিমান করে থাকা চলে ? কিন্তু একটা দ্বন্ধ তাঁর মনে বাসা বাঁধছে। এই romantic gesture টার পেছনে কি কটাক্ষ লুকিয়ে আছে ? "চা বানাতে পারো না" এই কথাটা কি প্রভাতের ব্যর্থতার কথা তুলে ধরছে ? সে নিজেকে পুরুষ

সিংহ মনে করে – আর পুরুষ সিংহ কিছু পারে না এমন হতেই পারে না। প্রভাত স্থির করলো এই লাঞ্ছনার বদলা সে নেবেই। কিন্তু এই পুরো কার্যসিদ্ধি করতে হবে সবার চোখের আড়ালে। লোকে জানতে পারলেই চরম বেইজতির সম্মুখীন হতে হবে। Hollywood action সিনেমার ভক্ত প্রভাত এর নাম দিলো অপারেশন সিংহ।
কিছুদিনের মধ্যেই গুপ্তচরের মতন রিনির থেকে প্রভাত কিছু তত্ব আবিষ্কার করেছে। এই যেমন রান্না করতে গেলে দুটো জিনিস খুব জরুরি। কি রাঁধবে ? আর কিভাবে রাঁধবে ?

Engineer মানুষ প্রভাত একটা বেশ detailed ফ্লোচার্ট বানিয়ে ফেললো। যদি সবজি রাঁধবে তাহলে কি সবজি রাঁধবে ? আলু, পটল, ফুলকপি, ঝিঙে ইত্যাদি। ডাল বানাবে ? তাহোলে কি ডাল ? মুগ, মুসুর, কলাই ? আমিষ খাবে ? তাহলে decide করো মাছ খাবে না মাংস খাবে ? ডিম্ ও খেতে পারো। এইটা confirm হয়ে গেলে এবার স্থির করতে হবে কি ভাবে রান্না করবে ? মানে ঝোল হবে, না tight ? সেদ্ধ হবে নাকি fry ? শুধু তাই নয়, youtube এ ভিডিও দেখে সে আন্দাজ করেছে কোন preparation সহজ আর কোনটা কঠিন। তার basis এ একটা করে difficulty score দিয়েছে। যেমন তার মনে হয়েছে ডাল ব্যাপারটা বেশ সোজা তাই তার স্কোর কম. আবার পাঠার মাংসের কষা বেশ কঠিন। তাই তার স্কোর অনেক বেশি। এক সপ্তাহ ধরে অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে প্রভাতের homework তৈরী। এবার execution এর পালা।
পুরো ব্যাপারটা গোপনে করতে হবে। তাই রিনির অফিস থেকে ফেরা আগেই তাকে ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলতে হবে। শুক্র বার দুপুর বেলা তাড়াতাড়ি অফিস থেকে ফায়ার এসেছে প্রভাত। আগে থেকেই স্থির করা ছিল সে ডাল বানাবে। রেসিপির ভিডিও ডাউনলোড করা আছে। বাড়িতে ডাল বানানোর সামগ্রী ও সব আছে। এখানেই বলে নেওয়া উচিত যে Youtube এ কয়েকটা ভিডিও দেখে প্রভাত ইতিমধ্যে গ্যাস জ্বালাতে শিখে গেছে। আর হ্যা Sim কথাটার মানেই সে এখন জানে।
বাড়ি ফিরে মুখ হাত ধুয়ে সোজা রান্না ঘরে প্রবেশ। আজ আর তার অহংকারে কোনো আঘাত পড়ছে না। এই রান্নাঘর কে জয় করতেই হবে । রেসিপি মিলিয়ে সে এক েকে সব সামগ্রী রান্নাঘরের কাউন্টার এর ওপর রেখেছে। একদম মাপ করে ডাল, তেল, নুন, জিরে, হলুদ আর জল বাটিতে বাটিতে করে সাজানো। রেসিপি অনুযায়ী ৫ বার ডাল ধোয়া হয়ে গেছে। প্রেসার cooker এর মধ্যেই প্রথমে জিরে তা ভেজে নিয়ে ডাল , জল, নুন, আর হলুদ দিয়ে ঢাকা দেওয়া হয়ে গেছে। গ্যাস জ্বলছে। এবার প্রতিখ্যা । থালি ৩ তে সিটি – ব্যাস কেল্লা ফতে ।
Cooker এর সামনে ঠায়ে দাঁড়িয়ে আছে প্রভাত। যেকোনো সময় সিটি মারা শুরু হবে। কিন্তু সিটি আর হচ্ছে না। থালি ধুয়ো বেরোচ্ছে। এবার প্রভাতএর একটু একটু চিন্তা হতে শুরু করলো। রেসিপির ভিডিও তে তো দেখলে ১০ মিনিটের মধ্যে সিটি দিয়ে দেবে। এখানে তো প্রায় আধ ঘন্টা হতে চললো। কিছু স্টেপ miss হয়ে গেলো কি ? সে ভালো করে আবার ভিডিও তা প্রথম থেকে দেখতে থাকলো – আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নিজের ভুল তা আবিষ্কার করলো। সে এটি অ্যামেচার, যে pressure cooker এর সিটি টাই লাগে নি। ভীষণ রাগ হলো। কিরকম irresponsible youtuber রে বাবা। সিটি টা লাগানোর কথা তা বেমালুম চেপে গেছে। কিন্তু এখন মাথা গরম করার সময় নেই। গ্যাস বন্ধ করে খুব সন্তর্পনে pressure এর ঢাকনি তা খুলেছে। ভিতরে তাকিয়ে আতঙ্কে তার শরীর ঠান্ডা হয়ে গেলো। ডাল আর ডাল নেই পুরো মাথা সন্দেশ হয়ে গেছে। এবার কি হবে ?

প্রভাত স্থির করলো এই বিপর্যয় এর সব প্রমাণ লোপাট করে ফেলতে হবে। সমস্ত সামগ্রী জায়গা মতন গুছিয়ে ফেলেছে। রান্নাঘর পরিষ্কার করে ফেলেছে। এবার প্রেসার থেকে মাথা সন্দেশ রুপি ডাল বার করে ফেলে দিলেই সব পরিষ্কার। প্রেসার তা নিয়ে ডাস্টবিনের দিকে এগোতে যাবে – এর মধ্যে হঠাৎ রিনির প্রবেশ।
ভূত দেখার মতন pressure cooker হাথে নিয়ে প্রভাত কিংকর্তবিমুঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। "ওমা pressure নিয়ে কি করছো ?" – রিনি অবাক হয়ে জিগেশ করলো। "ওকিছু না সরিয়ে রাখছিলাম। তুমি তৈরী হয়ে নাও, আজ বাইরে ডিনার" প্রভাত প্রশ্ন বদলের চেষ্টা করলো। তাকে অগ্রাহ্য করে রিনি এগিয়ে এসে তার হাত থেকে প্রেসারে তা টেনে নিলো। রিনির চোখ ছলছল করে উঠলো । প্রভাত মেঝের দিকে চেয়ে আছে। মালসমেত ধরা পড়া চোরের মতন সাজার অপেখ্যা করছে। "তুমি আমার

জন্য ডাল মাখা বানিয়েছো ? ডাল মাখা আমার favorite. মা ছাড়া কেউ বানাতে পারে না " রিনির কথায় প্রভাত চমকে উঠলো। ডাল মাখা ? সে আবার কি ? প্রভাত জবাব দেওয়ার আগেই রিনি তাকে জড়িয়ে ধরে বললো "I Love You". প্রভাত কিছুই বুঝতে পারছে না। কিন্তু এই পরিস্থিতে এর চেয়ে better outcome আশা করা যায় না।
সেদিন ডিনার এ বাইরে যাওয়া হয় নি। রিনি রুটি বানিয়েছে আর তাই দিয়ে এই accidental ডাল মাখা খাওয়া হয়েছে। খেতে মন্দ হয় নি। শুধু পরের বার থেকে জিরে আর জোয়ানের ফারাক তা জেনে রাখতে হবে। কিন্তু তাতে কিছু এসে যায় না কারণ সেদিন রান্নাঘর কে জয় করেছিল পুরুষ সিংহ প্রভাত !

"A man testing his limitation" – Sunit K. Addy

Taj Mahal - Vimarsh Vadlamani (7 Yrs)

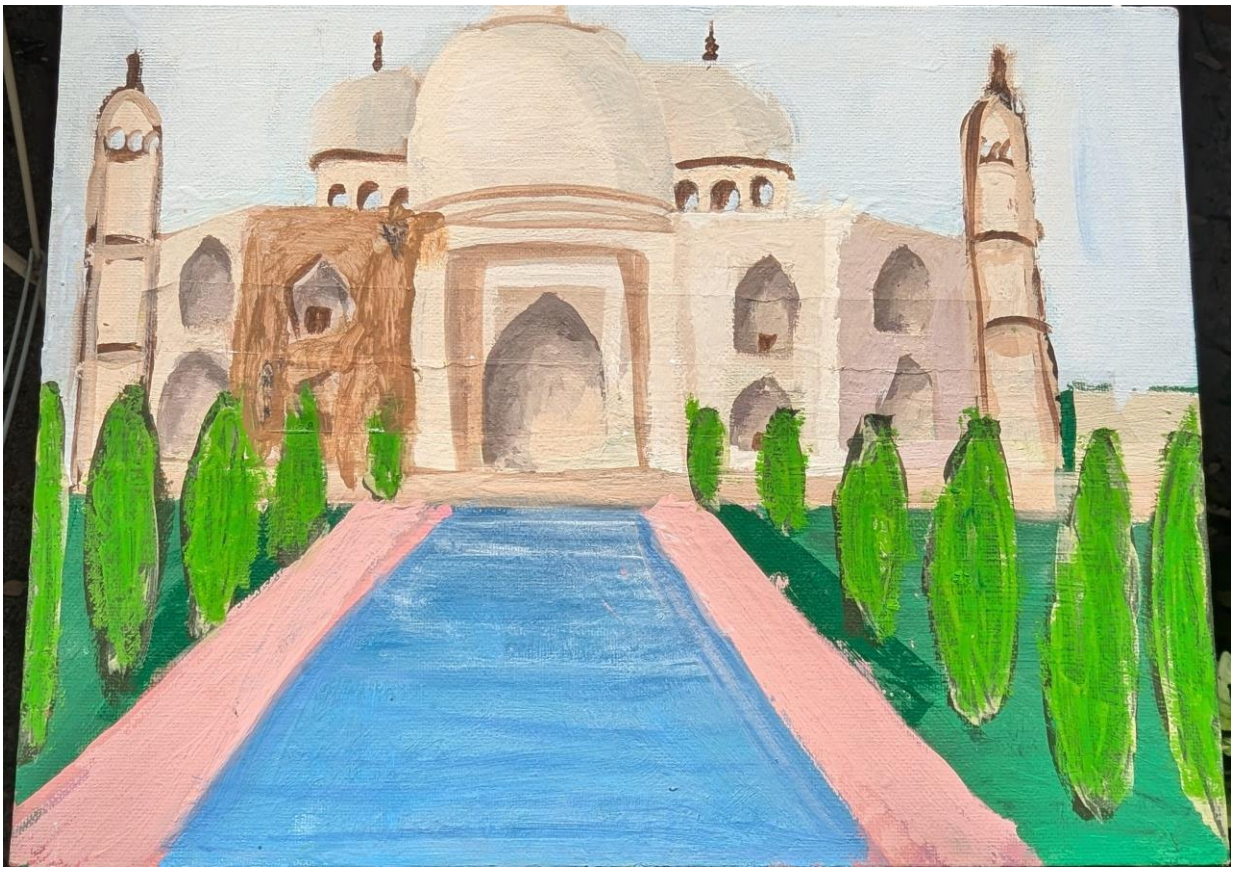

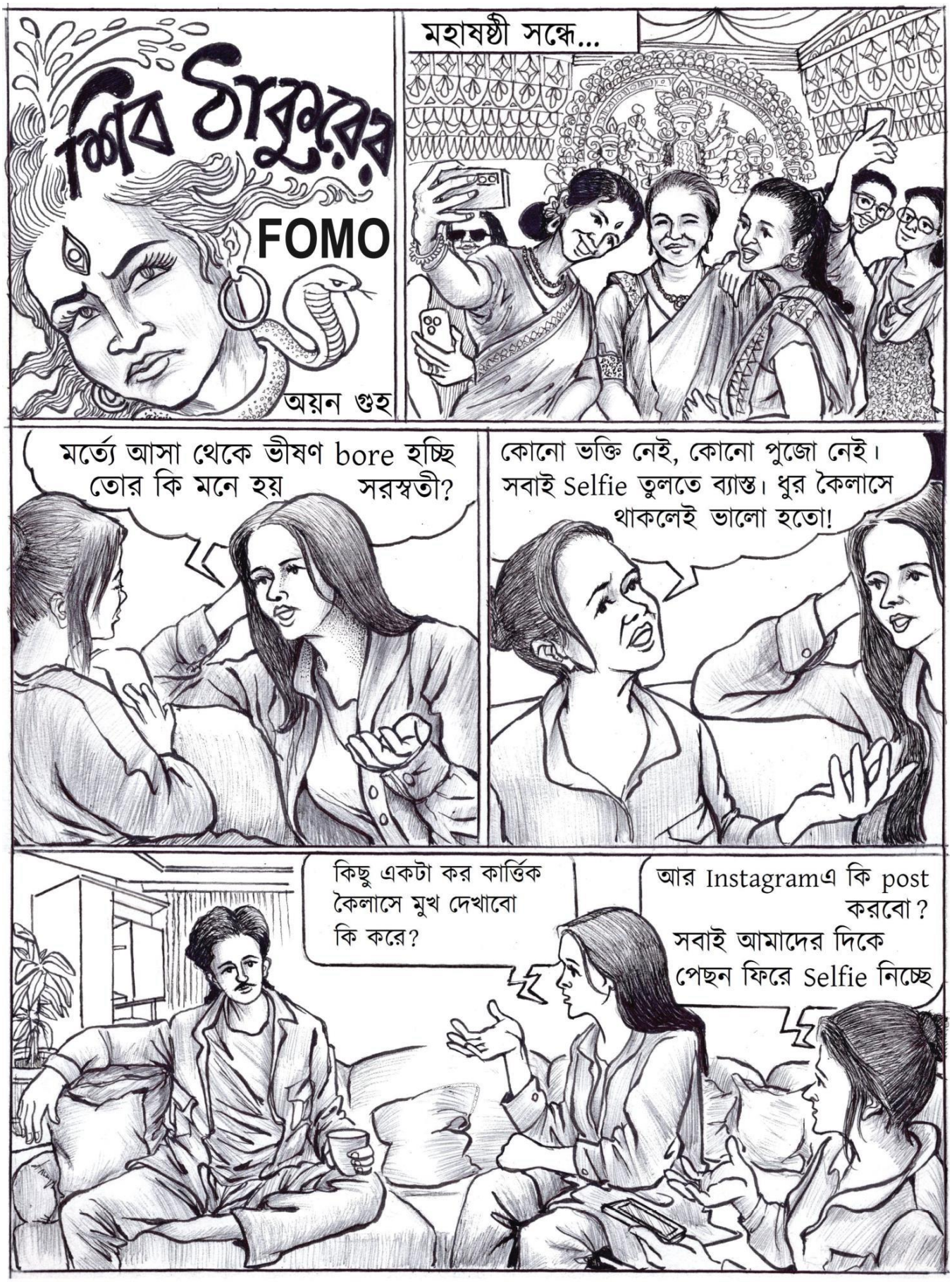
শিব ঠাকুরের
FOMO
অয়ন গুহ
মহাষষ্ঠী সন্ধে...
মর্ত্যে আসা থেকে ভীষণ bore হচ্ছি
তোর কি মনে হয় সরস্বতী?
কোনো ভক্তি নেই, কোনো পুজো নেই।
সবাই Selfie তুলতে ব্যাস্ত। ধুর কৈলাসে
থাকলেই ভালো হতো!
কিছু একটা কর কার্ত্তিক
কৈলাসে মুখ দেখাবো
কি করে?
আর Instagramএ কি post
করবো?
সবাই আমাদের দিকে
পেছন ফিরে Selfie নিচ্ছে

বাঃ মর্ত্যে নতুন প্রযুক্তি এসেছে। এই দ্যাখ্ কি রকম Realistic Video বানানো যায় !!
ChatGPT?
আজ থেকে তোদের Intagram update এর দায়িত্ব আমি আর গনশাদা নিলাম। দেখবি তোদের বন্ধুরা কেমন হিংসা করবে!
এদিকে কৈলাসে... ও মা!! লক্ষ্মী, সরস্বতী কেমন Party করছে দ্যাখ্
আর যাওয়ার আগে বলতো "মর্ত্য কি Boring"
এই সেরেছে নারদ মামা!!
রাধে রাধে, কি দেখা হচ্ছে? এতো পুলক কিসের ?
হুম্, এটাতো মহাদেবকে দেখাতে হচ্ছে..
দেবী মর্ত্যে গেলে বাড়ি বড়ো ফাঁকা লাগে। প্রতিবার বলে "মর্ত্যে যেতে ভালো লাগে না" কিন্তু তবু যাওয়া চাই
রাধে, রাধে, একটু আসতে পারি ?

এই দেখুন,মর্ত্যে অনন্ত আর রাধিকার বিবাহের নতুন video !!
সেকি ? সেই বিবাহ এখনো চলছে ? অনন্তকাল ধরে অনন্তের বিবাহ ...
এই দেখুন হিন্দি গানের সাথে লক্ষ্মী, সরস্বতী ও কার্ত্তিক কেমন নাচ করছেন।
আর দেবী দুর্গাও সেখানে উপস্থিত...
মর্ত্যে গিয়ে এতো ফুর্তি ? আর আমি এখানে ভেবে মরি !!
নন্দি ভৃঙ্গিকে ডাকো এর একটা বিহিত করতে হবে।
মর্ত্যে গিয়ে দেবীদের উপর গোপনে চোখ রাখবে – আর রোজ আমাকে প্রতিবেদন দেবে।

মর্ত্যে পঞ্চাশতম পার্টিতে...
না: এখানেও দেবীদের দেখছি না !
আঃ এখন গাঁজা খাওয়া বন্ধ কর। দেখছিস তো আমাদের কতো কাজ বাকি !
দাদা একটা টান Share করবেন?
Thank You দাদা.. আঃ আঃ এক টানেতেই যেন হাতে স্বর্গ পেয়ে গেলাম..
এমন খাঁটি জিনিস- একেবারে heavenly!
তোমায় party মাঝে পেয়েছি,ছেড়ে দেবো না। ছেড়ে দিলে - এমন মজা আর তো পাবো না..
ঠেলাঠেলি করবেন না...অনেক মাল আছে। সঠিক cash হাতে রাখুন।
বলি কি, ভালোই Income হয়েছে। মর্ত্যেই Business শুরু করি !
হ্যালো নারদ স্যার, হ্যাঁ,হ্যাঁ,ভালো আছি, হাতে লক্ষ্মী পেয়ে গিয়েছি! বাকি খোঁজ চালিয়ে যাচ্ছি স্যার!

বিজয়ার পর কৈলাসে...
এসো এসো..
খুব ফুর্তি করে এসেছো অ্যাঁ ? বিয়ে বাড়ি,নাচ, সব video দেখেছি!!
আহা, দাঁড়াও দাঁড়াও
ছিঃ ছিঃ মর্ত্যে গিয়ে এরকম কুরুচিপূর্ণ নাচ!! কোনো লজ্জা নেই??
এইসব কিছুই হয়নি। মর্ত্যের নতুন প্রযুক্তি দিয়ে এই রকম নকল video বানিয়েছে গণেশদা..
আরে হ্যাঁ, মা কিন্তু এখনো মর্ত্যে, বললো কিছু জরুরি কাজ সেরে আসছি -
তার মানে বিয়েবাড়ি, নাচ সবই নকল ? দেবী কোন আসল কাজ করার জন্য মর্ত্যে রয়ে গেলেন ?
অসুর নিধন এখনো বাকি
STOP ABUSE OF WOMEN
JUSTICE DELAYED JUSTICE DENIED
WE WANT NO SAFETY NO
JUSTICE FOR ABHAYA
NO MERCY TO RAPIST
JUSTICE FOR ABHAYA
সমাপ্ত

মুরগির মাংস

শ্রেয়সী দত্ত ভট্টাচার্য্য

আমার জন্ম হয়ে ব্রাহ্মণ পরিবারে । উপাধি হিসেবে আমার পূর্ব পুরুষগন যে পদবীটি পেয়েছিলেন তা হলো ভট্টাচার্য্য। আসলে উপাধিটি হল সান্যাল । আমার এসব কথা জানা হয়েছে আমার ঠাকুমা র কাছে থেকে । ঠাকুমা র কাছে এটাও শুনেছি যে আমরা না কি ভট্টাচার্য্য বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ। এ মানে বোঝার ক্ষমতা তখন যেমন ছিল না, আজ আর সেটা নিয়ে বিশেষ ভাবে ভাবতেও চাই না। কারণ বিয়ের পর দিদি ও আমি বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে কোনো ভাবে কাছে আর আস্তে পারিনি। তার বিশেষ কারণ হলো বাবা-মার মতে আমরা দুই বোন অব্রাহ্মণকে বিয়ে করেছি।

যাই হোক আসল কথায় আসি, যেই কারণে আমার এতসব কথা বলা ---- তা হল, মুরগীর মাংস। আমরা ছোটবেলায় কখনই মুরগীর মাংস সেভাবে খাইনি। কোনো বিয়ে বাড়ি তে হয়তো মাঝে মাঝে খেয়েছি। কারণ আমার বাবা র বাড়ির দিকের কোনো আত্মীয় র বিয়ের অনুষ্ঠানে পাঁঠার মাংস খাওয়ার চলন তো ছিলই না, জন্মদিন ও যেকোনো শুভ কাজেও না। সেখানে মুরগীর মাংস অনেক দূর অস্ত। তবে বাবা-মা এর বন্ধুদের, পাড়া-প্রতিবেশীর ও আমার মামাবাড়ির কোনো অনুষ্ঠান থাকলে মুরগির ঠ্যাঙের দর্শন হত। সেদিন মন ভোরে মুরগির মাংসের লোভ মিটিয়ে নিতাম। কিন্তু বাড়িতে আসার পর গঙ্গাজল গায়ে ও মাথায় ছিটিয়ে শুদ্ধ করানো হতো। কেননা এই মাংস টি খেলে পরে ব্রাহ্মণ পরিবারের সমস্ত নিয়ম কানুনে যেমন ছেদ্ পরে তেমনি সেই পরিবারের যে মানুষটি খায় সেও অশুদ্ধ হয়ে যায়। তাই এই বিশেষ ভাবে শুদ্ধ হওয়ার নিয়মটি ও দেওয়া হয়েছিল।

একবার আমার ছোটবেলায় আমার ঠাকুরদার দিকে কোনো আতত্মীয় এসেছিলেন। আমি আর দিদি কিস্সান অরেঞ্জ স্কোয়াশের গ্লাস হাতে নিয়ে খেলা করছিলাম। হটাৎ করে শুনতে পাই, আমার ঠাকুমাকে ওনারা জিজ্ঞাসা করছেন, আচ্ছা তোমার নাতনিদের প্রিয় খাবার কি? আমি মনে মনে ভাবছি ঠাকুমা নিশ্চই বলবেন, মুরগীর মাংস। কিন্তু সেটাই না বলে ঠাকুমা বলেন, মাছের রকমারি রান্না ওদের দুইটির খুব ভালো লাগে।আমি তো সেদিন অবাক! সত্যি বলতে মাছ খেতে ভালোই লাগতো না। আশায় আশায় বসে থাকতাম মুরগীর মাংসের জন্য। সেটাই পাওয়া আমাদের ছোটবেলায় বিশাল ব্যাপার ছিল। (কারণ দূর্গা পুজো বাড়িতে হলে নিয়মকানুন সেইসব বাড়িতে অনেক বেশি থাকে।) সেখানে মাছের অবাধ যাতায়াত ছিল বলা যেতে পারে। অনেক বছর পরে মা কে জিজ্ঞেস করে জানতে পেরেছিলাম, ঠাকুমা সেদিন যদি মুরগীর মাংসের কথা বলতেন, তাহলে আর কোনোদিন ভট্টাচার্য্য বাড়ির কোনো আতত্মীয় আমাদের বাড়ির ত্রিসীমানায় ঘেঁষতো না।

আমাদের বাড়িতে যেমন এটির নাম নেওয়া বারণ ছিল, ঠিক তার অন্য দিকে আমার মামাবাড়িতে তার প্রবেশ অবাধ ছিল। আমার মায়েরা বন্দ্যোপাধ্যায় ব্রাহ্মণ ছিলেন। কিন্তু আমার দাদু ও দিদু ঘোর কমিউনিসট ছিলেন। সেই কারণে তাঁরা কোনো নিয়ম না মানায়ে আমার জন্য এই মাংসটির প্রবেশ অবাধ ছিল। আমার যাওয়ার সাথে সাথে তার ও বাজারের থেকে আবির্ভাব হত। তখন তো আর আজকের দিনের মতো মোবাইলে ক্যামেরা ছিল না যে ভিডিও করে রাখবো, শুধু স্মৃতিতে আজ তা ধরে রেখেছি। যদি ভিডিও বা ছবি তুলে রাখতাম তাহলে আজ মন টা আরো ভালো হয়ে যেত । দিদুর আর বড়মামী র হাতের সেই ধয়া ওঠা মুরগীর মাংসের ঝোল, ধনেপাতা দিয়ে মুসুরির ডাল, সালাড, আর ভাত ছিল আমার জন্য অমৃত।
চারদিন পর যখন মামাবাড়ি থেকে বাড়ি ফিরতাম, তখন মা, পুরো রাস্তা শিখিয়ে আনতেন সব খাবার এর নাম বলবে বাড়িতে গিয়ে, কিন্তু মুরগির মাংসের কথা বোলো না। মা জানতেন, যদি আমরা গিয়ে বলি তাহলে শুদ্ধ করার নিয়ম আবার শুরু হবে। কিন্তু দিদি আর আমি যাদবপুর থেকে সল্টলেক এর এতোটা রাস্তা যখন S14 নম্বরের বাস-এ করে কলকাতা ঘুরে এসে পৌছতাম তখন ক্লান্ত হয়ে সব যেতাম ভুলে। একে ঘুম আর পেটে খিদে তাও আবার মুরগীর মাংস না পাওয়ার কষ্ট।
বাড়ির গেট দিয়ে ঢুকতেই যে ঘটনা ঘটত তা খুব ই দুঃখজনক। আমার দাদাই, আমার ঠাকুরদা,

প্রথমেই জিজ্ঞাসা করতেন, কি খবর ভাই? মামাবাড়িতে গিয়ে কি খেয়েছো? অমনি আমরা দুই বোন প্রথমেই বলতাম মুরগীর ঠ্যাং খেয়েছি। ব্যাস, আবার গঙ্গা জল দিয়ে শুদ্ধ করে দিন শুরু না শেষ হতো সেটা সেদিন বুঝতাম না।

দাদাই আমাদের সবাইকে ছেড়ে চলে যাওয়ার প্রায়ে পনেরো বছর পর বাবা আর মেজ কাকা বাড়ির অনেক নিয়ম ভেঙ্গে দিয়েছিলেন। আমাদের বাড়িতে সব পার্বনে লুচি খাওয়া বন্ধ হলেও বিশেষ পুজো পার্বনে তা জারী করা হয়ে। যেমন খাসির মাংস প্রতি রবিবার, তেমনি সারা সপ্তাহের মধ্যে মুরগির মাংসটির সম্মানও দেওয়া হয়। এসব নিয়ম পরিবর্তন এর জন্য আর আমাদের ছোটদের ভালো লাগাকে গুরুত্ব দেওয়ার জন্য বাবা আর কাকু কে প্রতিবাদ করতে দেখেছিলাম। আত্মীয়দের বাড়িতে না যাওয়া, ঠাকুমা কে বোঝানো, সেইসব। তবে আমার মনে সেই সময়ে খুব আনন্দ ছিল, সেটা আশা করি পাঠকগণ কে আলাদা ভাবে আমায় আর বোঝাতে হবে না।

এইসব বলার একটাই কারণ যে, এই মুরগীর মাংস জীবনের একটা সময়ে এমন একটা জিনিস ছিল যাকে না পাওয়ার বাসনা মনের মধ্যেই থেকে গেছিলো। অনেক পরে সে যেমন মনের চাহিদার পরিতৃপ্তি ঘটিয়েছিল তেমনি আজ তাকে সম্পূর্ণভাবেই ত্যাগ করেছি।
একটা জিনিস বুঝেছি, প্রথম থেকে খাবারের অভ্যাস না থাকলে সেটি খাদ্য হিসেবে কখনওই প্রিয় খাবার হয়ে না। সময়ের সাথে দেখেছি সত্যি মাংসের বিভিন্ন পদের থেকে মাছের রকমারি পদ আজ আমার ও দিদির সত্যি ভীষণ প্রিয়। আমরা দুজনে আজ আর কেউ মুরগির মাংস খাইনা। ঠাকুমা সেদিন জানতেন বলেই সেই কথাটা বলেছিলেন তার নাতনিদের প্রসঙ্গে। এই দূরদৃষ্টি কে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই। প্রণাম জানাই আমার বাবা ও কাকার সেই সময়ের প্রগতিবাদী যুক্তি কে। কারণ তাদের মতো মানুষ না থাকলে সংসারের ঘেরাটোপ এর জাল থেকে নতুন প্রজন্ম কোনোদিন বেরতে পারতো না । আমার জীবনের কাহিনী র সাথে মুরগীর মাংস আরও ঘরে ঘরে কাহিনী তৈরী করে পথ এগিয়ে চলুক এই কামনাই রাখি।

চলার পথে

শুভা আঢ্য

কিছুদিন ধরে শয্যাশায়ী না হলেও শয্যাবন্দী হয়ে আছি। শরীরটা স্থির হয়েছে আর সেই সুযোগে মনটা হয়েছে দারুন অস্থির। এতো রকমের নানান ভাবনা আমার এই ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে কেমন করে স্থান পাচ্ছে কে জানে? একজন যায় তো দশ জন ঢুকে পড়ে। কোন আগল দিলে এদের ঠেকিয়ে রাখা যেতে পারে, সেটা ও তো ভাবনার কথা! কি আতান্তর!!

আজ সকাল থেকে একটি ভাবনা আর সবাইকে ছাপিয়ে আমার মনে বেশ ছড়িয়ে ছিটিয়ে চেপে বসেছে। প্রশ্ন করছে,-- তোমাকে-এ পথ কোথায় নিয়ে চলেছে তার কি কোনও হদিশ আছে?

তাইতো? পথ আছে, তাই চলছি আর চলছি! সেই কবে, কোন এক জন্মক্ষণে শুরু হয়ে ছিল এই পথ চলা। সে চলা আমাকে কোন সাগর পারে, কোন তুষার মৌলি শৈলচূড়ায়, কোন ছায়া ঢাকা, শান্ত ছোট নদীটির পারে,ঘুমন্ত ছোট্ট গ্রামের কোলে নিয়ে চলেছে তার ঠিকানা কি আমার জানা আছে? কই, দিনের হাজার কাজের মাঝে এ কথা তো ভাবা হয়নি?

আজ এই ভাবনাটির চারপাশে অন্য ভাবনা গুলো গোল হয়ে বসে আমায় যেন ডেকে বলল, তাইতো, চলেছো তো, কিন্তু যাচ্ছো কোথায়? তাদের বলি, থামো থামো একটু ভেবে দেখি।

সেই যবে থেকে মনে আছে, শুনেছি কেবল, ওঠো ওঠো, চলো চলো, এই কাজ করতে হবে, ওই কাজটি বাকি রইল-- সবার সঙ্গে চলার স্রোতে ভেসে চলেছি, কোথায় কেন,---- সে কথা আমি তো জানিনা!

কবে যেন শুরু হয়েছে এই পথ চলা, তার শেষ কোথায়?

ঠিক! ঠিক!! কোথায় চলেছি? এর আগে তো এই কথাটা নিয়ে কখনও ভাবিনি। একটুকুও না! একেবারেই না!! শুধু পা ফেলা আর তোলা। দিনের পর দিন আসে রাতের পর রাত। ঋতুর পর ঋতু আসে নানা রূপ ধরে, দিন গুনে গুনে বছরের পর বছর যায় চলে। তাদের পাশে পাশে আমিও চলি। কোথায় যাচ্ছি, কেনই বা যাচ্ছি সে কথা তো মনে আসেনি রোজকার ব্যস্ততার মাঝে।

কত নতুন জনের সঙ্গে দেখা হলো, কত মানুষ কাছে এলো, কেউ রইলো বন্ধু হয়ে, কেউ হাতে পরালো চিরকালের ভালোবাসার রাখী, কেউ অন্য পথে গেল হারিয়ে। পৃথিবীর কোনায় কোনায় দেখা হলো কত আশ্চর্য্যের ,কত বিস্ময়ের, কত সৌন্দর্যের সঙ্গে, সেই সঙ্গে দেখেছি কত অন্যায়ের, কত নৃশংসতার, কত মিথ্যার, অসুন্দর প্রকাশ। কোথাও আপনজনের ভালোবাসার গহীন জলে দিয়েছি ডুব, অতল থেকে তুলে এনেছি সেই সাত রাজার ধন একটি মানিক, কোথাও পেয়েছি শিশুর স্বর্গীয় হাসির পসরা, জীবনের আকাশে উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠেছে ইন্দ্র ধনুর সাতটি রঙের আল্পনা, আবার কোথাও সয়ে নিতে হয়েছে অন্যায় হিংসার অকারণ ক্রোধের নির্মম আঘাত?

কোন এক অমোঘ ইঙ্গিতে শুধু চলা, আর এগিয়ে চলা। এরই মাঝে, কখনো পথের ধরে বেঁধেছি ঘর, আবার সে ঘর তুলে নিয়ে চলেছি নিরুদ্দেশের পথে। থেমে থাকার কিংবা ফিরে যাবার কোনও অবকাশ ছিল না, ছিলনা কোনও ভুল শুধরে নেবার উপায়। শুধু চলা, আর এগিয়ে চলা। তবে কখনো বা ক্ষণিক থেমে পথের ধারে বসে একটু জিরিয়ে নেবার ফাঁকে ফাঁকে হয়তো কুড়িয়ে নিয়েছি মিষ্টি কোনো স্মৃতি, একঝুড়ি মন ভোলানো হাসি, কিংবা কারো হাতের মালার সুগন্ধ। সেগুলি লুকিয়ে থাকে মনের আনাচে কানাচে, হঠাৎ হঠৎ দেখা দিয়ে যায় , মনে বুলিয়ে দিয়ে যায় ভুলে যাওয়া সুখের পরশ।

কোথায় চলেছি এ নিয়ে যখন এতদিন কোনও ভাবনা ছিলনা তাহলে আজ কেন আমাকে কি তাই নিয়ে ভাবতে বসতে হবে?

এখনো তো সে চলা থামেনি, গতি কিছুটা কমেছে এইমাত্র। আসন্ন সন্ধ্যার ছায়া ঘেরা পথেই এখন আমার চলা। অতীতের এখন ওখান থেকে খুঁজে পাওয়া, কুড়িয়ে পাওয়া, সঞ্চয়গুলি আমার চলার পথের পাথেয়। সেই সঞ্চিত ধনেই আমার পাত্রটি পরিপূর্ণ। কোথায় চলেছি, কেন চলেছি, এ যাত্রা তা আর জানা হলোনা। আর তা নিয়ে তেমন ভাবনারও কিছু দেখিনা।

একসময় ছিল যখন পিছনের ফেলে আসা সময়ের কথা ভাবার প্রয়োজন ছিল কম। সামনের দিকে

এগিয়ে যাওয়ার ত্বরা ছিল অনেক। মনে হতো কি জানি কি আছে পথের বাঁকে , কোন সে অবাক দ্রব্যটি, এগিয়ে না গেলে দেখতে যদি না পাই ? এখন মনে হয়, নাইবা পেলাম তার দেখা, যা পেয়েছি তাই বা কম কিসে?

ফাঁকিবাজি

শুভ্র চ্যাটার্জী

লিখতে হবে পুজোর লেখা
জমার দিন নোটিশে,
পরে আছে অনেক সময়
বসন্ত বহে বাতাসে।

চারি দিকে ফুল ফুটেছে
ঘাসেতে বুনো নীল,
কায়দা করে ছবি গেঁথে
ইন্সটাগ্রামে তৈরী রিল।

স্কুলে এখন গরমের ছুটি
কি করে যাই এড়িয়ে,
এখন বরং সময় করে
অল্প আসি বেরিয়ে।

এমনি করেই চঞ্চল মন
জুগিয়ে নেয় খাদ্য,
কবিতার খাতা গড়ের মাঠ
একটাও নেই পদ্য।

দিন গেলো, হপ্তা গেলো,
কাটলো কয়েক মাস,
আর বাকি ঘন্টা চব্বিশ
অতএব সর্বনাশ।

যখন ফিরে এলো হুঁশ
খাতা কলম সাজিয়ে,
ভাবতে বসি কিযে লিখি
মাথা দুবার বাজিয়ে।

রাজনীতি, অর্থনীতি,
কতো নীতির চর্চা,
করে চলি সকাল বিকেল
লাগে নাকো খরচা।

কিন্তু যখন লিখব ভাবি
বিষয় খুঁজি হন্যে,
মগজ পুরো ফাঁকা স্লেট
শুরু আবার শূন্যে।

শেষমেষ প্রবল চাপে
লিখেছি দু-এক কলি,
দশের কথা নাইবা বললাম
নিজেরই কথা বলি।

এই ভাবে হলো লেখা
জমার শেষের দিন,
বেঁচে থাকুক সবার মাঝে
ধ্রুবতারা ম্যাগাজিন।

অক্সিজেন বনাম প্লুটো

সুদীপ সরকার

"আরে আমাদের বুম্বাদার কথা বলছো?" চায় একটা সশব্দে সুড়ুৎ করে চুমুক দিয়ে ঝন্টুদা মন্তব্য করলো।

শানু আর বাঁটি চোখাচোখি করে নিলো। আজ রবিবারের খেলা জমে গেছে। ঝন্টুদা হলো এদের পাড়ার ঘনাদা। একটা কথার ছুৎ পেলেই হলো, পুরো এক ঘন্টা জমজমাট। ভালো নাম অভিজিৎ গাঙ্গুলী। কলকাতায় এক সরকারী দফতরে কাজ করে। বই পড়তে আর আড্ডা দিতে প্রচন্ড ভালোবাসে। মাঝে মাঝে আবেগের বসে একটু বেশি কথা বলে ফেলে ওই আরকি। ওটাই পাড়ার ছেলেদের আনন্দ। কয়েকজন আবার রসিকতার ছলে ঝন্টুদা আর ঘনাদার সন্ধি করে ঝগাদা বলে ডাকে। ওরাই আবার টপিক ঠিক মতো ধরিয়ে দিয়ে চুপটি করে শোনে।

আজ বাংলা সিনেমা নিয়ে কোনো একটা কথা উঠতেই ঝন্টুদা বুম্বাদার প্রসঙ্গ তুললো। বুম্বাদা থুড়ি বাংলা সিনেমার প্রসেনজিৎ যেন ওনার ছোটবেলার ইয়ার। যাই হোক শানু খুব খুশি, গাড়িতে গিয়ার্ পরে গেছে, এবার জম্পেশ করে আড্ডা জমে যাবে।

ঝন্টুদা আবার সশব্দে চায় একটা দীর্ঘ্য চুমুক দিয়ে বললে

– জানিস বুম্বাদা কিন্তু আগে অনেক আজে বাজে বই করেছিল, এই যেমন ধর বেদে মেয়ে জ্যোৎস্না, এই সিনেমাটি কি কোনো সিনেমা হলো। গ্রাম গঞ্জের পাবলিক দেখে তাই সিনেমাটি হিট।

– কিন্তু ঝন্টুদা ওই বইতে তো চিরঞ্জিত ছিল – বাঁটি ফুট কাটলো

– তুই থামবি, থট প্রসেস পুরো হতে দিবিতো। তা না করে মাঝখানে ফুট কেটে গল্পের ফ্লো কুচি কুচি করে কেটে দিলি। সাধে কি তোর নাম বাঁটি।

এই বাঁটি হচ্ছে সবথেকে কমবয়সী মেম্বার এবং সবচেয়ে ফিচকেল পাবলিক। ভালো নাম ব্রজেশ্বর চ্যাটার্জী। ডাক নাম ব্রজ। সেই থেকে কবে যে নামটা বাঁটি হয়ে গেলো কেউ জানে না। পাড়ার জনগণ আবার মাঝে মাঝে ব্রজ দাদু বলে খেপায়। জিজ্ঞেস করলে বলে ব্রজেশ্বর নাকি দাদু মার্ক নাম। বাঁটি পড়াশোনায় বেশ ভালো, শিবপুর থেকে মেকানিকাল করে এখন MBA করছে।

– আহা! রাগ করো কেন, মাথায় এলো তাই বলে দিলাম, নাও বলো, আমি আর মুখ খুলবো না. বাঁটি আমতা আমতা করে বললে

– হাঁ বলছিলাম এই বেদের মেয়ে জ্যোৎনা বইটি এতো হিট হলো, তাই দেখে আমাদের বুম্বাদা ভাবলো আমিও এইরকম একটি বই বানাবো নাম হবে "মাঝির ছেলে মদনা "। গ্রাম গঞ্জে হেব্বি চলবে। কিন্তু দেখ কপাল, ফিনান্স করার কোনো লোক পেলো না। "মাঝির ছেলে মদনা" যদি তৈরী হতো সব রেকর্ড ব্র্যাক করতো।

– আচ্ছা মদনার রোলটি কি তোমার বুম্বাদা করতো? শানু এতক্ষন পরে মুখ খুললো

– আলবাত, হেব্বি হিট হতো, গ্রামে গঞ্জে তো সব গোমুখ্যুর দল। ওরা তো ভীড় করে মেঘে ঢাকা তারা দেখবে না, ওরা ওই মদনা কেই দেখতো।

শানু মানে আমাদের শান্তনু মন্ডল। বেসরকারি ব্যাংকে চাকরি করে, সারাদিন zoom call-এ বসের গালাগালি খায় আর বিকেল বেলা রকে বসে আড্ডা দিয়ে মনের ঝাল মেটায়।

–একটি ড্রিম সিকোয়েন্সএ মদনা আবার নীল শার্ট আর হলুদ প্যান্ট পরে গানও গাইতো – বাঁটি আবার ফুট কাটলো।

ঝন্টুদা আবার বাঁটির দিকে কটকট করে তাকিয়ে নিলো।

– আচ্ছা হিরোইন কে? আলুর বস্তা ? শানু নির্দোষ মুখ করে জিজ্ঞেস করলে

– ওটা আবার কে ?

– কেন সেঞ্চুরি রায়, মাথায় দুই ঝুঁটি করে তাতে লাল ফিতে বেঁধে থপ থপ করে মাঠে নেচে বেড়াতো। বেশ ভালো লাগতো। এখন রাজনীতি করে তাই মাঝে মাঝে গ্রাম গঞ্জে মুখ দেখাতে যায়, এই সিনেমাটি করলে অ্যাকচুয়াল এক্সপেরিয়েন্স হতো। – শানু জবাব দিলো

ঝন্টুদার গল্পের অনেক স্টক, এই কিছু দিন আগে লাদাখ ঘুরতে গিয়েছিলো। ফেরত এসে গল্পের খেপ

খুলে দিয়েছিলো। উনি নাকি নিখিল ব্যানার্জী শুনতে শুনতে ভাড়ার গাড়ি নিজেই চালাচ্ছিলেন। গান আর দৃশ্যবলি দেখে এতই মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন যে গাড়ি কখন ১২০ কমঃএ চালাচ্ছিলেন সেটা বুঝতে পারেনি। আলাপ থেকে জোর ঝালা অব্দি পৌঁছনোর আগেই বর্ডার পুলিশ থামতে বললে তবে হুঁশ ফিরেছিল।
বাঁটি শুনে বলেছিলো - ভাগ্গিশ ঝালা অব্দি পৌঁছে যাননি, না হলে স্পিড তুলে সিধে চায়না পৌঁছে যেতেন।
- বাজে কথা বললে আমি কিন্তু চলে যাবো, তোরা কি ভাবিস আমি গুলতানি করছি? তোরা আমাকে ভেবেছিসটা কি?
- আহা! রাগ করছো কেন। এই বাঁটি টা এমনি আজে বাজে বকে। তুমি বস, আমি আর একটা চা বলছি। এই গজা, আরও তিনটে চা আর তিনটে সুজির বিসুইট। --শানু অর্ডার দিলো
চায় এক চুমুক দিয়ে ঝন্টুদা আবার শুরু করলে
- জানিস ভাষা বড় ভালো জিনিস। প্রত্যেক মানুষের অন্তত চারটে ভাষা জানা উচিত। ব্রেন ফাঙ্কশন বাড়ে। আমাদের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী নারাসিম্হা রায় ১২ ভাষা জানতেন।
- তুমি কটা ভাষা জানো ঝন্টুদা? শানু জিজ্ঞেস করলো
- আমি লিখতে পড়তে বলতে তিনটে আর শুধু বলতে দুটো। ঝন্টুদা বিসকুট টি চায় ডুবিয়ে তৎখনাত মুখে চালান করে বললে।
- বাংলা, হিন্দি, ইংরেজি। আর বলতে পারি ওড়িয়া আর আসামি।
বাঁটি ভারের চা শেষ করে ভাঁড়টি দূরে ডাস্টবিন এ টিপ্ করে ছুঁড়ে দিয়ে বললে
- ঝন্টুদা ওড়িয়ার কয়েকটা নমুনা হয়ে যাক ।
ঝন্টুদা বাঁটির দিকে কটকট করে তাকিয়ে ছন্দ করে বললে
বাঙালু চা খাইলু
ভাঁড় ভাংগিলুউ
পয়সা দিলু না।
বাঁটি ঝন্টুদার দিকে তাকিয়ে বললে
- ঝন্টুদা আমি তোমাকে এতো ভালোবাসি আর তুমি আমাকে এইরকম বলতে পারলে ?
- আলবাত পারলাম, জানিস সমরেশ মজুমদার সাতকাহন উপন্যাসে বলেছিলেন "ভালোবাসা হল বেনারসী শাড়ির মত, ন্যাপথালিন দিয়ে যত্ন করে আলমারিতে তুলে রাখতে হয়, তাকে আটপৌরে ব্যবহার করলেই সব শেষ"। আমি ওনার খুব বড় ফ্যান, তাই এইটা আমি খুব ভালো ভাবেই ফলো করি।
হটাৎ শানু "এই যে দেবুদা কোথায় যাওয়া হচ্ছে?" বলে চেঁচিয়ে উঠলো।
দেবুদা মানে দেবজ্যোতি মন্ডল, হাতে বাজারের থলে নিয়ে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলো। বাজারের থলে শানুর দিকে তুলে ধরে নাড়িয়ে বললে
"অফিস যাচ্ছি, তাড়া আছে"
এই দেবুদা হচ্ছে পাড়ার ইন্টেলেকচুয়াল মানে বুদ্ধিজিবি। বেশি ফিচেল কথা বলেন না। তবে পাড়ার ছেলে রা এনার গাড়িও ঠিক গিয়ার-এ ফেলে দিতে পারলে ইনফরমেশন ওভারলোড হবার সম্ভাবনা অনেক। তখন ওনার সব বিষয়ে জ্ঞান ভান্ডার খুলে যায়।
ঝন্টুদা কিন্তু এনাকে খুব একটা পছন্দ করে না। ঝন্টুদার বক্তব্য "লোকটা বড্ডো বেশি কথা বলে" লোকে বলে "পেশাদার প্রতিদ্বন্দ্বিতা"
কথাটি খুব একটা মিথ্যে নয়।
শানু চেঁচিয়ে বললে
- দেবুদা দু মিনিট দাঁড়িয়ে যান, আমেরিকা কেমন ঘোরা হলো বলুন না
দেবুদা গত সপ্তাহে ছেলের কাছ থেকে ফিরেছেন। উনি কাছে আসতেই ওনার জন্য একটা চা বলে দেওয়া হলো ।
গরম চায়ের ভাঁড় দুই আংগুলে ব্যালান্স করে খুব ছোট্ট করে চুমুক দিয়ে বললে
- জানিস এবার আমেরিকাতে একটা দারুন অভিজ্ঞতা হলো। তোরা তো জানিস আমার মাছ ধরার শখ আছে। এবার আমি মাছ কে সাঁতার কাটা শিখিয়েছি। গল্পটা হলো এই, আমার ছেলের আমার

মতো মাছ ধরবার শখ। ওখানকার স্থানীয় ক্লাবের সদস্য। তাই এক রোববার বাবা ছেলে মাছ ধরতে গিয়ে এক পেল্লাই জ্যান্ত বাসা মাছ ধরে নিয়ে এলাম বাড়িতে। বাড়ি এসেই বাথটাবে ছেড়েদিলাম। কিছুক্ষন ধরে দেখলাম মাছটি বাথটাবের এক কোণে গিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাই আমি মাছটাকে হাতে করে বাথটব ঘুরিয়ে জায়গা বাতলে দিলাম। মাছটি তার পরে খুব খুশি মনে সাঁতার কাটতে লাগলো। ঝন্টুদা মন দিয়ে শুনছিলো এবং ভ্রু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলে

– মাছটিকে তো তারপর কেটে খেয়ে ফেলেছিলেন নিশ্চই, অত কষ্ট করতে গেলেন কেন?

ছেলেরা হ্যা হ্যা করে অট্টহাঁসি দিয়ে উঠলো।

দেবুদা কিছুক্ষন চুপ করে ওখান থেকে চলে গিয়ে আবার ফেরত এসে বলেছিলেন।

– জানিস আমি হচ্ছি Pluto গ্রহের মতো। কেন জানিস? এই কিছু বছর আগে Pluto কে কিছু বিজ্ঞানি গ্রহের তালিকা থেকে সরিয়ে উপগ্রহর তালিকায় ফেলে দিয়েছে। এই বিশাল মহাকাশে একটি ছোট্ট তারা সূর্য, সেই সূর্যের তৃতীয় গ্রহের কয়েকটি ক্ষুদ্র প্রাণী Pluto কে যাই বলুকনা কেন, প্লুটো কিন্তু নিজের মনে মহা আনন্দে সূর্যের চারি দিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তার কিছুই এসে যায় না। বুঝলি ঝন্টু আমি প্লুটোর মতো, কে কি বললো আমি তোয়াক্কা করিনা, তোকেও না। তুইও চেষ্টা কর Plutoর মতো হতে।

এই বলে দেবুদা গটগট করে বাজারের দিকে চলে গেলেন। বাঁটি কিছুক্ষন পর ছোট্ট করে ফুট কাটলো –যাহ ! ঝন্টুদা তুমি তো আজ কেস খেয়ে গেলে যে – আরে ধ্যুস! আমি Pluto হতে যাবো কেন। কথা নেই বার্তা নেই অন্ধকারে গোল হয়ে সূর্যের চারিদিকে ঘুরতে আমার বয়ে গেছে। জানিস, ও যদি প্লুটো হয়ে আমি হলাম গিয়ে অক্সিজেন। এই তোদের জন্য, আমি হলাম অক্সিজেন। আমি ছাড়া তোরা কি বাঁচতে পারবি? পারবি না।

শানু, বাঁটি আর অন্যরা সেদিন কিছু আর বলেনি কারণ কথাটি কিন্তু ষোলোআনা খাঁটি।

Outside - Aarav Guha (10 yrs)

শয়তানের ঘন্টা বাজে

সুস্মিতা সেন

অদিতির রোজ সবার সঙ্গে বসে DINNER করা হয় না। ও একলা আগেই DINNER করে নেয়। মা সবসময় বাবার জন্য অপেক্ষা করে। বাবার বাড়ী ফেরার ঠিক থাকেনা। অদিতির বাবা শহরের COMMISSIONAR OF POLICE. শহরের শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখার দায়িত্ব তাঁর। মুখ্যমন্ত্রীও বাবাকে খুব ভরসা করেন। বাড়ীতেও বাবার কড়া Discipline এর দড়িতে অদিতি আর ওর মা আষ্ঠেপৃষ্ঠে বাঁধা থাকে। মা বাবাকে খুব ভয় পায়। বাবার ৬ ফুট ২ ইঞ্চির দীর্ঘকায় পেটানো চেহারার সামনে ৫ ফুট ১ ইঞ্চির ছোটোখাটো চেহারার M.A. B.ED. পাশ করা একদা একটি স্কুলের সবার প্রিয় দিদিমণি, অদিতির মা সবসময় কুঁকড়ে থাকে। অদিতির সঙ্গেও ওর বাবার দূরত্বের সম্পর্ক।

পড়াশুনায় মেধাবী ছাত্রী অদিতি । H.S. পাশ করার পরে স্বপ্ন ছিল ইংরাজী সাহিত্য নিয়ে ওর প্রিয় UNIVERSITY তে পড়বে। কিন্তু ওর প্রবল ব্যক্তিত্বময় বাবার ইচ্ছার কাছে নিজের ইচ্ছাকে বলি দিয়ে JEE MEDICAL এ বসতে হয়। ওর যা RANK ছিল তাতে হয়তো দূরের কোনো ছোট্ট শহরের কোনো MEDICAL COLLEGE এ CHANCE পেতো। কিন্তু অনেক প্রভাবশালী লোকেদের সঙ্গে বাবার সুসম্পর্ক থাকার সুযোগে এই শহরের সবচেয়ে নামী MEDICAL COLLEGE এ অদিতি ADMISSION পেয়ে গেল। COLLEGE এর PROFESSOR রা CLASS এর পরেও ওর সঙ্গে কথা বলতে পছন্দ করত। যদিও অদিতি একটু INTROVERT গোছের মেয়ে। ও একটু আড়ালে থাকতেই পছন্দ করত।

প্রথমবার আড়াল থেকে বাইরে এসেছিল কলেজে FRESHERS' WELCOME এর দিন। খুব ভয়ে ভয়ে ছিল অদিতি। FRESHERS' WELCOME এর নাম করে NEW COMER দের সঙ্গে খুব খারাপ ভাবে RAGGING করার অনেক গল্প শুনেছিল অদিতি। স্বভাব ভীতু অদিতি আরো আতঙ্কিত হয়েছিল সেদিন। SEMINAR ROOM এ SENIOR আর JUNIOR MEDICAL STUDENT রা ভিড় করেছিল। প্রথমেই একজন SENIOR ছাত্র MICROPHONE হাতে নিয়ে বললো, "আজ আমাদের COLLEGE এ নতুনদের স্বাগত জানাচ্ছি। কারো আতঙ্কিত হবার কোনো কারন নেই। আজ একটা মজার খেলার মধ্যে দিয়ে সবার সঙ্গে পরিচয় হবে। STAGE এর উপরে একটা কাঁচের বড় BOWL এর মধ্যে অনেকগুলো ভাজ করা কাগজের টুকরো রাখা আছে। প্রতিটি কাগজে আলাদা আলাদা INSTRUCTION লেখা আছে। আমরা FIRST YEAR এর STUDENT দের ROLL NO 1 থেকে CALL করব আর সেই সঙ্গে THIRD YEAR এর ROLL NO 1 কে ডাকব। দুজনে একসঙ্গে STAGE এ উঠবে। FIRST YEAR ROLL NO 1 BOWL থেকে যে কোনো একটা কাগজ তুলে নিয়ে অন্য জনকে দেবে। অন্যজন INSTRUCTION টা জোরে পড়বে। STAGE এ বসে থাকা JUDGE STARTING BELL আর END BELL বাজাবে। মাঝের তিন মিনিটের মধ্যে দুজনকে PERFORM করতে হবে ।"

অদিতি ভাবতে লাগলো কি জানি কি PERFORM করতে বলবে। অদিতির ROLL NO পিছনের দিকে কাজই ওর পালা আসার আগেই বুঝতে পারবে কি হচ্ছে ব্যাপারটা। বেশ কয়েকটা জুটির PERFORM করার পরে অদিতির মন থেকে কখন ভয়টা কেটে গেল। বেশ মজার খেলা হচ্ছিল। অদিতিও হাততালি দিচ্ছিল। INSTRUCTION গুলো বেশ মজার ছিল। যেমন, সপ্তপদী সিনেমার বিখ্যাত MOTOR CYCLE RIDE SCENE ACTING, রাগী অঙ্কের TEACHER আর অঙ্ক পরীক্ষায় ZERO পাওয়া STUDENT এর কথোপকথন, নেতা আর চামচা, ছেলের জন্য পাত্রী দেখা, দুই মাতালের আলাপ, প্রথম DATING ইত্যাদি।

এর মধ্যে হঠাৎ ঘোষনা হল FIRST YEAR ROLL NO 55 অদিতি রায় AND THIRD YEAR ROLL NO 55 অনুভব সেন। অদিতি STAGE এর দিকে যেতে যেতে অনুভব সেনকে খুঁজতে লাগল। আরে ওই ছেলেটাই তো যে প্রথমে ঘোষনা করছিল। কাঁচের BOWL থেকে একটা কাগজের টুকরো নিয়ে অনুভবের হাতে দিল অদিতি। এবার অনুভবকে কাছে থেকে ভাল করে লক্ষ্য করে। বেশ লম্বা, রোগা চেহারা, শ্যামলা রঙ, চশমায় ঢাকা উজ্জ্বল বদ্ধিদীপ্ত দুই চোখ। অনুভব ঘোষনা করে কাজী নজরুলের বিখ্যাত গান 'কারার

ওই লৌহ কপাট' দ্বৈত সঙ্গীত করতে হবে। অদিতি খুব ভাল গান করে। গানটা ও প্রাণের ভালোবাসা থেকে গায় আর পড়াশুনাটা মন দিয়ে করে।অনুভব মিষ্টি করে বলে, 'এটা আমার খুব প্রিয় গান। আমি ধরছি তুমি গলা মিলিও তাতেই হবে।' অনুভব গান ধরল, – কারার ওই লৌহ কপাট ভেঙ্গে ফেল, কররে লোপাট রক্ত জমাট শিকল পূজার পাষাণ বেদী। অদিতির গায়ে কাঁটা দিল। এই রোগা ছেলেটার গলায় এত জোর! কি গম্ গম্ স্বরে গাইছে। সমস্ত সেমিনার হল হাতে তাল দিচ্ছে। অদিতি ওর জোয়ারি গলায় গেয়ে উঠল, – ওরে ও তরুণ ইশান বাজা তোর প্রলয় বিষাণ, রক্ত নিশান উঠুক প্রাচীর প্রাচীর ভেদী। সেমিনার হলে হাততালির ঢেউ উঠল। বিচারক এই প্রথম FINISH BELL বাজাল না। গান শেষ হলে আবার হাততালি। অনুভব এসে অদিতিকে জড়িয়ে ধরল উচ্ছ্বসিত ভাবে বলল, OH! BRILIANT. তুমি এত ভাল গান করো। অদিতির অসোয়াস্থি হচ্ছিল আবার ভাল ও লাগছিল।

FIRST YEAR এর STUDENT রা অনুরোধ করল এই খেলাটা CONTINUE না করে আমরা অদিতি আর অনুভবদার আরো গান শুনতে চাই । সমস্ত HALL এই প্রস্তাব সমর্থন করল। তারপর সেদিন অদিতি আর অনুভব আরো পাঁচটা গান গাইল। মুক্তির মন্দির সোঁপান তলে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে, DOWN THE WAY, সবশেষে ও আমার দেশের মাটি। অদিতির গায়ের রোমকূপ খাড়া হয়ে যাচ্ছিল। প্রতিটি গানের আকুতি যেন হৃদয়ের গভীরে পৌঁছে হৃদয়কে উদ্বেল করে তুলছিল। গান শেষের পরে হাততালি আর থামে না। সেদিনই পর্দানশীন অদিতিকে অনুভব যেন পর্দার আড়াল ছিঁড়ে খোলা প্রান্তরে দাঁড় করিয়ে সূর্যস্নান করিয়ে দিল। একদিনে অনেক বন্ধু হয়ে গেল অদিতির। ভীষন ভালো লাগার ভেলায় ভাসতে ভাসতে বাড়ী ফিরলো অদিতি।

অদিতিকে এত খুশি দেখে মা বললো, 'কি রে আজ তোদের FRESHERS' WELCOME কেমন হলো? মাকে জড়িয়ে ধরে অদিতি বললো , 'খুব ভাল হয়েছে মা। জানো আজ আমি আর অনুভবদা ৬ খানা DUET গান করেছি। সবাই খুব হাততালি দিয়েছে।' মা বলল, অনুভবদা কে? অদিতি চুপ করে গেল। একটু পরে বললো THIRD YEAR এর একজন দাদা, খুব ভালো গান করে মা। সেদিন পড়তে বসেও গুন গুন করে গান করছিল অদিতি।

সেদিন বাবাও তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরে এসেছিল। সবাই একসঙ্গে বসে রাতের DINNER করছিল। হঠাৎ বাবা বললো, 'তুমি নাকি আজ কলেজে খুব ভালো গান করেছ? THAT'S GOOD, কিন্তু পড়াশুনা আগে। তোমাকে ডাক্তার হতে হবে, গায়িকা নয়। অদিতির মনে আজ যে আনন্দের বাতিটা জ্বলছিল সেটা দপ করে নিভে গেল। মা ও খাওয়া থামিয়ে মাথা নিচু করে বসে রইল। বাবা খাওয়া শেষ করে টেবিল ছেড়ে উঠে গেল। অদিতি আর মা ও নিঃশব্দে খাওয়া শেষ করল।

এর পরের একটা বছর শুধু বাড়ী, হাসপাতাল আর পড়াশুনা চলল। গান গাইবার আর সময় পায় না অদিতি। কখনো কখনো হাসপাতালের ক্যান্টিনে চা খেতে গেলে অনুভবদার সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়। তখন ও হয়তো কোনো টেবিলে একদল ছেলের সঙ্গে বসে কোনো বিষয় নিয়ে তর্ক চালাচ্ছে। অদিতিকে দেখলেই ওই টেবিল ছেড়ে অদিতির টেবিলে উঠে আসতো। অদিতি দু কাপ চায়ের ORDER করতো। অনুভবদা চা খেতে খেতে অদিতির সঙ্গে নান বিষয়ে গল্প জুড়ত। বেশির ভাগ গল্পের বিষয়ই ছিল সমাজের বিভিন্ন স্তরের নানা প্রতিষ্ঠানে দীর্ঘ দিন ধরে ঘটে যওয়া অন্যায় এবং বেআইনী কাজ, যার কোনো প্রতিকার করা যাচ্ছে না। কেউ সাহস করে প্রতিবাদ করছে না। বেশিরভাগ লোকই মাথা ঘামাচ্ছে না। অদিতি মনে মনে ভাবতো ও নিজেই তো এই SYSTEM এর একজন অন্যায় সুবিধাভোগী। নইলে কি আর এই কলেজে তার পড়ার সুযোগ হত? অদিতি বুঝতে পারছিল কলেজের হাওয়া গরম হয়ে উঠছে। মাঝে মাঝে কিছু ছেলে জড় হয়ে SLOGAN দিত।

একদিন PRINCIPAL JUNIOR ছাত্রদের MEETING ডেকে সতর্ক করলেন, JUNIOR যেন কোনো প্ররোচনায় পা না দেয়। তাদের সামনে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। সেটা যেন তারা নষ্ট না করে। JUNIOR ছাত্ররা অবশ্য সবরকম ঝামেলা থেকেই দূরে থাকত। এরপর একদিন সবাই NOTICE পেলো যে 'হাসপাতালের পড়াশুনার বা চিকিৎসার সুস্থ পরিবেশ বিঘ্নিত করার যে রাজনৈতিক চক্রান্ত চলছে তাতে যারা প্রত্যক্ষ

বা পরোক্ষ ভাবে যুক্ত থাকবে তাদের MEDICAL COLLEGE এর STUDENT REGISTRATION বাতিল করা হবে।'এই অবস্থায় একদিন ক্যান্টিনে চা খেতে গিয়ে অদিতি দেখে একটা টেবিলে অনুভবদা একা বসে চা খাচ্ছে। অদিতি ঢুকতেই ওকে ওই টেবিলে ডাকল। অনুভবদা যেন ওর জন্যই অপেক্ষা করছিল। অদিতি বসতেই নিচুস্বরে বললো, 'আমাকে একটু সাহায্য করবে অদিতি?'
অদিতি বললো, 'কী সাহায্য? নিশ্চই করব।'
অনুভব বললো, 'আমি তোমাকে কতগুলি হাতে লেখা কাগজ দেবো। সেই লেখাগুলো ছাপতে হবে। তোমার LAPTOP থেকে SINGLE PAGE TYPE করে PENDRIVE এ তুলে দিয়ে ORIGINALটা DELET করে দেবে। আজ রাত্রেই এটা করে রাখবে। কাল কলেজে কোনো সময় আমি কাগজগুলো আর PENDRIVE তোমার কাছ থেকে নিয়ে নেবো।'
অদিতি বললো, 'এতে আর অসুবিধার কী আছে? এটুকু সাহায্য আমি করেই পারবো।'
অনুভব বললো, 'আর এসব কথা কাউকে বোলো না। ছুটির পরে পাঁচ মিনিটের জন্য একা SEMINAR HALL এ এসো। তখন লেখাগুলো আর PENDRIVE দিয়ে দেবো।'
অদিতি একটু অবাক হলেও ছুটির সময় একাই SEMINAR HALL এ গেলো। অনুভব ভেতরে একাই ছিল। অদিতি যেতেই একটা মোটা খাম ওর হাতে দিয়ে ব্যাগে ঢুকিয়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ী চলে যেতে বললো। অদিতি সেইমতো দেরি না করে বাড়ী চলে এল।

সেদিন রাতে বাবার সঙ্গে বসে DINNER করার সৌভাগ্য হয়েছিল। খেতে খেতে বাবার লাল রঙের MOBILEটা বেজে উঠল। বাবার দুটো MOBILE, একটি লাল অন্যটি কালো। লাল MOBILE টা বাজতেই বাবা MOBILE নিয়ে DINING ROOM এর বাইরে চলে গেলেন। মা স্বগোতক্তি করল, 'আবার শয়তানের ঘন্টা বেজেছে। কার সর্বনাশ হবে কে জানে।' বাবা কারোর সামনে কখনো লাল ফোনে কথা বলেন না। মা জানে বিশ্বস্ত কারো কারো সঙ্গে বাবা ওই ফোনে খুব গোপণীয় কথা বলেন, গোপন নির্দেশ দেন। মার সন্দেহ সেগুলি সব অনৈতিক নির্দেশ।

খাওয়া শেষ করে ঘরে গিয়ে অনুভবদার দেওয়া খামটা থেকে কাগজগুলো আর একটা PENDRIVE বার করল। ৩০ পাতায় অনেক কাটাকুটি করে লেখা। অদিতি আগে লেখাগুলি একবার পড়ে বিষয়বস্তুটা বোঝার চেষ্টা করল। কিন্তু পড়তে পড়তে অদিতি ক্রমশ উত্তেজিত হতে থাকল। এ সব কী লেখা! হাসপাতালে এ সব কী চলছে? শুধু প্রভাব খাটিয়ে নয় টাকা নিয়েও ভর্তি, টাকা দিয়ে পরীক্ষায় পাশ, পরীক্ষার আগে QUESTION কেনা, হাসপাতাল STORE এ ভেজাল ওষুধ SUPPLY, PATIENT PARTY র কিনে দেওয়া MEDICINE PATIENT কে কম করে DOSE দিয়ে বাকীটা আবার STORE এ ফেরত পাঠানো, MORGUE থেকে বেওয়ারিশ মৃতদেহ পাচার, HOSTEL এ জুয়া, মাদক এবং অন্যান্য চক্র চালানো। কোটি কোটি টাকার বেআইনী কারবার চলছে। রাগে অদিতির মাথার রগ দুটো দপ দপ করতে লাগল। নিজেকে এই SYSTEM এর একজন অন্যায্য সুবিধাভোগী বুঝে নিজের জন্য লজ্জা করতে লাগল। এরপর LAPTOP ON করে PENDRIVE টা ঢুকিয়ে লেখাগুলো টাইপ করতে শুরু করল। রাত দুটোর সময় লেখা শেষ হলে ANUVAB নামে সেভ করে LAPTOP বন্ধ করল। তারপর কাগজগুলো আর PENDRIVE খামে ঢুকিয়ে খামের মুখ আটকে কলেজের ব্যাগে ঢুকিয়ে নিল। ঘুম আসছিল না বলে টিভি অন করল অদিতি। নামী নিউজ চ্যানেলে খবর বলা মেয়েটি চিৎকার করে BREAKING NEWS বলছে – 'শহরের নামী মেডিকেল কলেজের ছাত্র হোষ্টেলের ভিতরে বেআইনী কার্যকলাপের জন্য প্রমাণ সহ গ্রেফতার।' টিভিতে দেখাচ্ছে অনুভবদাকে ঘাড় ধরে কয়েকজন পুলিশ ভ্যানে তুলছে। সঙ্গে একটি মেয়েও আছে। খবর পড়ুয়া মেয়েটি তখনও চিৎকার করছে –'আমাদের চ্যানেলেই প্রথম অনুভব রায় নামে মেধাবী মেডিকেল ছাত্রের কুকীর্তি ফাঁস। হোষ্টেল রুমে ড্রাগ, মধুচক্র, নীলছবির সুটিং এবং আরো অনেক বেআইনী কার্যকলাপ চালাতো। আগামীকাল তাকে আদালতে তোলা হবে । এই কাজে আর কে কে যুক্ত আছে পুলিশ সে ব্যাপারে তদন্ত শুরু করেছে। এই অবিশ্বাস্য খবর শুনে হতবুদ্ধি হয়ে যায় অদিতি। রাতে আর ঘুম আসে না।

পরের দিন কলেজে গিয়ে দেখে সব ছাত্ররা কলেজের গেটে জড়ো হয়ে SLOGAN দিচ্ছে – অনুভব রায়কে চক্রান্ত করে মিথ্যা মামলায় ফাঁসানোর বিরুদ্ধে সমস্ত ছাত্ররা এক হও। কোর্টে অনুভবের জামিন হলোনা।

তখন প্রতিদিন কলেজে, রাস্তায়, সারা শহরে, প্রথমে অদিতিদের কলেজে তারপর একে একে অন্য কলেজের ছাত্ররাও অনুভবেরর মুক্তির দাবীতে মিছিল বার করল। সাত দিন পরে জামিন পেয়ে অনুভব বাইরে এল। এই কদিনে চেহারা এত খারাপ হয়ে গেছে যে বোঝা যাচ্ছে যথেষ্ট শারীরিক আর মানসিক যন্ত্রণার মধ্যে ছিল অনুভব।

হোষ্টেলের সুপার অনুভবকে পরের দিনই হোষ্টল ছাড়ার NOTICEধরিয়ে দিল। অনুভব কলেজে আসার পরে ওর চারিদিকে শুধু ছাত্রদের ভিড়। অদিতি ওকে থামটা ফেরত দেবার সুযোগ পাচ্ছে না। এই সময় অনুভবের প্রিয় বন্ধু সৌরভ এসে বললো দুটোর সময় অনুভবের জন্য লাইব্রেরীর সামনে অপেক্ষা কোরো। ঠিক দুটোর সময় অুনুভব এসেই জিজ্ঞাসা করল,'PENDRIVE এর কাজ হয়েছে? অদিতি ব্যাগ থেকে থামটা বার করে অনুভবের হাতে দিয়ে দিল। অনুভব যাবার সময় বলে গেল, 'সাবধানে থেকো অদিতি। খুব খারাপ সময় আসছে। আমি খুন হতে পারি। সৌরভের সঙ্গে যোগাযোগ রেখো।' অদিতিকে কোনো কথার সুযোগ না দিয়েই দ্রুত চলে গেল অনুভব। অদিতি সেদিন নানা দুশ্চিন্তা নিয়ে বাড়ী ফিরল।

পরের দিন BREAKFAST TABLE এ বাবাকে দেখল না। অদিতিকে চা দিয়ে মা উল্টো দিকের চেয়ারে বসল। আস্ত আস্তে বললো, 'জানিস কাল রাতে অনুভব বলে ছেলেটা ওদের হোষ্টেলের চার তলার ছাদ থেকে লাফিয়ে আত্মহত্যা করেছে। বাবা বলছিল ছেলেটা এত কুকীর্তি করে ধরা পড়ে গিয়ে অপমানের গ্লানিতে আত্মহত্যা করেছে। অদিতি চিৎকার করে বললো, 'আমি বিশ্বাস করি না। অনুভব দা আত্মহত্যা করতে পারে না। বাবা মিথ্যা কথা বলেছে। অনুভব দা খুন হয়েছে। মা দৌড়ে এসে অদিতির মুখ চাপা দিল। 'চুপ চুপ এসব কথা মুখেও আনিস না, সর্বনাশ হয়ে যাবে।' মায়ের দু চোখ বেয়ে জল গড়াচ্ছে।
অদিতির অস্থির লাগছে। ঘরে গিয়ে T V খুললো। সারা শহর যেন রাস্তায় নেমে পড়েছে। কাল রাতে ঘটনাটা ঘটেছে। আর আজ সকালেই অতি তৎপরতায় পুলিশ আত্মহত্যার CASE সাজিয়ে BODY POST MORTEM করতে পাঠিয়ে দিয়েছে। দুপুরের মধ্যে মেদিনীপুরের গ্রাম থেকে পুলিশের গাড়ীতে করে ওর বৃদ্ধ বাবা মাকে নিয়ে আসা হল। তারপর সন্ধ্যের মধ্যেই কড়া পুলিশ পাহারায় শহরের শ্মশানেই দাহ কার্য শেষ করে আবার ওর বাবা মা কে পুলিশের গাড়ী করেই তাদের গ্রামের বাড়ীতে পাঠিয়ে দেয়া হল। যেন সমস্ত SCRIPT রেডি ছিল যাতে ২৪ ঘন্টার মধ্যে OPERATION ANUVAB শেষ হল। ওই বিপদজ্জনক রোগা ছেলেটার কোনো চিহ্ন রইল না।

বাবা সেদিন অনেক রাত্রে বাড়ী ফিরেছিল। অদিতি তখনো ঘুমায় নি। ঘর অন্ধকার করে ব্যালকনির মেঝেতে বসে চুপচাপ কাঁদছিল অদিতি। হঠাৎ শুনতে পেল বাবার সেই শয়তানের ঘন্টা বাজছে। মা বাবার বেডরুমের লাগোয়া ব্যালকনিতে বাবাকে কারো সঙ্গে উত্তেজিত ভাবে কথা বলতে শুনল। 'কি বলছ কোনো কাগজ খুঁজে পাও নি। আগে তো পিটিয়ে কাগজগুলো কোথায় আছে জানতে। তারপর না হয় ছাদ থেকে ফেলে দিতে। ওই লেখাগুলো বাইরে বেরলে তো আগুন জ্বলে যাবে। তখন সামলানো যাবে না। শোনো কাল সকাল থেকে ওর বন্ধুদের DRUG এর CASE দিয়ে তোলা শুরু কর। থানায় নিয়ে গিয়ে আদর করলেই সব আন্দোলন বেড়িয়ে যাবে। সব PLAN রেডি করে আমাকে এক ঘন্টা পরে ফোন করো। বাবা আবার ঘরে ঢুকে ব্যালকনির দরজাটা বন্ধ করে দিল।

অদিতির মাথা একটা হীম শীতল স্রোত শিঁরদাড়ার মধ্য থেকে নীচে নামছে। এ কি ভয়ঙ্কর কথা শুনল । অনুভবদাকে পুলিশ চারতলার ছাদ থেকে নীচে ফেলে দিয়ে খুন করে সেটাকে আত্মহত্যা বলে REPORT করেছে। ভীষন অস্থির লাগছে। কিছু একটা করতে হবে। ঘরের ভিতরে এসে MOBILE খুলে দেখল হোয়াটস এ্যাপে সৌরভদার নম্বর পাঠিয়েছে। ঘড়িতে দেখল রাত দুটো বাজে। মরিয়া হয়ে সৌরভদাকে PHONE করল অদিতি। সৌরভ সঙ্গে সঙ্গে PHONE ধরল, 'এখনো ঘুমাওনি অদিতি?'
'কী করে ঘুমাবো সৌরভদা, পুলিশ অনুভবদাকে চারতলার ছাদ থেকে নীচে ফেলে দিয়ে খুন করেছে।'আমরা সব জানি। হোষ্টেলের কয়েকজন ছেলে দেখেছে। ভয়ে কেউ মুখ খুলছে না। অনেকে আজ হোষ্টেল ছেড়ে বাড়ী চলে গেছে। খুন করবে PLAN করেই পুলিশ জামিনের বিরোধিতা করে

অনুভবকে POLICE CUSTODYতে রাখে নি। ছেড়ে দিয়েছে।''ওরা অনুভবদার লেখা গুলো খুঁজছে। কাল তোমাদেরও DRUG এর CASE দিয়ে ARREST করবে। তোমরা কিছু একটা করো সৌরভদা।'
'আজ রাতে আমরা কেউ হোষ্টেলে নেই। আশঙ্কা ছিল আমরাও ARREST হতে পারি। তোমার PENDRIVE এ তোলা লেখা গুলো আমরা আজ রাত্রেই বিভিন্ন NEWS CHANNEL এ মেল করছি। বিভিন্ন SOCIAL MEDIA তে ছড়িয়ে দিচ্ছি। সবাইকে জানিয়ে দিচ্ছি আগামীকাল বিকাল তিনটার সময় আমাদের কলেজ গেট থেকে প্রতিবাদ মিছিল বার হবে। আমরা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এই অন্যায়ের জন্য বিচারের দাবী জানাতে যাবো। আমরা সমাজের স্তরের মানুষকে এই মিছিলে যোগ দেবার আহ্বান জানাবো। জনগণ দাবী করলে বিচার হবেই।'

অদিতি আবার এসে ব্যালকনিতে চুপ করে বসে থাকে। একটু পরেই আবার বাবা পাশের ব্যালকনিতে আসে। হাতে শয়তানের ঘন্টা বাজছে। শুধু বাবার কথা শুনতে পাচ্ছে অদিতি।
'কী হল, কালকের PLAN ফাইনাল করেছ তো? কী? সব MEDIA তে MAIL করে জানিয়ে দিয়েছে। শোন, সব NEWS CHANNEL আর খবরের কাগজ অফিসকে সাবধান করে দাও এই সংক্রান্ত কোনো NEWS যেন TELECAST বা ছাপানো না হয়। বরং এই ডাক্তারী ছাত্রদের সঙ্গে ড্রাগচক্রের যোগের কোনো টিপস দিয়ে সেটা প্রচার করতে বলো। তোমার একটা লোককে ড্রাগ পেডলার বলে ARREST কর। রিপোর্টারদের কী বলবে STORY বানিয়ে শিখিয়ে দিও। আর যদি কোনো বড় মিছিল হয় তোমরা তো জানই কিভাবে সেটা আটকাতে হবে। বিশুকে বলে রাখবে ওর ১০-১২ টা ছেলেকে যেন রেডি হয়ে মিছিলে থাকে। কোনো ACTION করতে হলে তুমি বিশুকে ফোন করবে। তারপর POLICE FORCE যা করা উচিত তাই করবে'। বিশ্বস্ত অনুচরের সঙ্গে ঠান্ডা মাথায় মানুষ মারার ঘৃণ্য পরিকল্পনা শেষ করে শয়তানের যন্ত্রটা বন্ধ করে অদিতির বাবা নিশ্চিন্তে ঘুমাতে গেল। এবার আর আতঙ্কিত হল না অদিতি শুধু চোয়াল শক্ত করে রইল। সৌরভদাকে ফোন করে জানিয়ে দিল মিছিলে কিছু সমাজবিরোধী ঢুকে ঝামেলা পাকাতে পারে।

সারা রাত ঘুম হলো না অদিতির। সকালে উঠেই টিভি খুললো। আবার ব্রেকিং নিউজ। কাল রাতে পুলিশের হাতে ধরা পড়া এক মাদক বিক্রেতা রিপোর্টারদের নানা প্রশ্নের জবাবে জানাচ্ছে সে বেশ কয়েকজন ডাক্তারী ছাত্রকে মাদক বেচত। এদের মধ্যে যে ছেলেটা আত্মহত্যা করেছে সে ও ছিল। তারপর পুলিশ তাকে ভ্যানে তুলে নিল। কোনো চ্যানেলে আজকের মিছিলের বা পাঠানো MAIL এর আর কোনো খবর নেই। মিছিলের খবর হয়তো দেরী করেই জানাবে যাতে দূরের লোকেরা সময় মতো মিছিলে জমায়েত হতে না পারে। বাবা বেরোবার আগে বলে গেলেন 'আজ কোথাও বেরোবে না, শহরে গোলমাল হতে পারে।

বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে ভাবছিল অদিতি, এই মানুষটা শুধু নিজের মেয়ের নিরাপত্তার কথা ভাবছে। আর সমাজের ভয়ঙ্কর ভ্রষ্টাচারের মদত দিয়ে অসহায় দুজন বৃদ্ধ বাবা মায়ের কোল খালি করে তাদের একমাত্র সন্তানকে খুন করালো। নিজের উপরেই রাগ আর ঘেন্না হচ্ছিল। বাথরুমে সাওয়ারটা খুলে প্রায় আধ ঘন্টা জলের ধারায় নিজেকে গ্লানি মুক্ত করার চেষ্টা করল অদিতি।
দুপুর বেলা মায়ের সঙ্গে বসে দুপুরের খাওয়া শেষ হলে মা যখন ঘরে বিশ্রাম নিতে গেল ঘড়িতে তখন ঠিক দুপুর দুটো বাজে। অদিতি চুপি চুপি বাড়ী থেকে বেড়িয়ে তিনটের মধ্যে কলেজে পৌঁছে গিয়ে মিছিলের ভিড়ে নিজেকে মিশিয়ে দিল।

ঠিক তিনটেয় কলেজের গেট থেকে মিছিল এগোনো শুরু হল। সেই সঙ্গে অনুভবের দেওয়া তথ্য গুলো লিফলেটের মতো মিছিলে, রাস্তায়, আশেপাশের দোকানে, থেমে থাকা বাস, গাড়ী, সব লোকের কাছে বিলি হচ্ছিল। বিভিন্ন জায়গায় পুলিশ শান্তিপূর্ণ মিছিল আটকানোর চেষ্টা করল। জলকামান, কাঁদানে গ্যাস সবই ব্যবহার হল। মিছিল একটুর জন্য থমকালো কিন্তু আবআর এগোলো। বিভিন্ন উপনদীর মতো সব দিক থেকে আরো মিছিল এসে মিলিত হয়ে একটা মহামিছিল তৈরী হল। অদিতি মিছিলের স্রোতে ভাসতে ভাসতে সামনে চলে এল। হঠাৎ মিছিলের মধ্য থেকে কারা যেন পুলিশের দিকে বোমা ছুঁড়ল, গুলি চালালো। কিন্তু পুলিশের গায়ে কোনোটাই লাগলো না। এরপরেই পুলিশ গুলি চালালো। অদিতি দেখল সৌরভদা কাধ চেপে বসে পড়ল আর অদিতির বুকে জোর একটা ধাক্কা লাগল।

অদিতির বাড়ীতে আবার শয়তানের ঘন্টা বাজছে। শহরে গোলমাল চলছে। অদিতির বাড়ী নেই, ফোন বন্ধ। মায়ের ফোন পেয়ে ওর বাবা তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরে এসেছেন। শয়তানের ঘন্টা কানের কাছে নিয়ে বিরক্ত ভাবে বললেন, 'আবার কী হল? মিছিল তো ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছে।
স্যার, পুলিশের গুলিতে একটা ছেলে আহত হয়েছে আর একটি ডাক্তারী ছাত্রীর বুকে গুলি লেগে SPOT DEAD হয়েছে।

আমাকে ফোন করেছ কেন? একটা FIR করে সব কাগজপত্র রেডি করে বডি POST MORTEM করতে পাঠিয়ে দাও। আর ওর বাড়ীর লোককে খবর দাও।সব ফর্মালিটি যেন ঠিকঠাক হয়। আমি ব্যস্ত আছি। এখন আর ফোন কোরো না'।ফোন কেটে দিলেন শহরের C P।
কিন্তু আবার শয়তানের ঘন্টা বাজতে থাকে। ফোনের ওপারে CP র বিশ্বস্ত পুলিশ অফিসারটি ভাবতে থাকে স্যার মেয়েটির বাড়ীতে খবর দিতে বললেন। কিন্তু ওনাকে তো বলা হল না মেয়েটির নাম অদিতি রায় আর ওর মোবাইলে বাবা বলে স্যারের PERSONAL নম্বরটা সেভ করা আছে।
অত্যন্ত বিশ্বাসী ও দায়িত্ববান অফিসারটি এই জরুরী খবরটা দেবার জন্য বার বার ফোন করতে থাকেন। ওপারে শয়তানের ঘন্টা বাজতেই থাকে।

Fall
Sharanya Chatterjee (5 yrs)

All over India
Rajonya Saha (8 yrs)

আত্মীয় স্বজন

স্বপ্না মুখার্জী

ছোটোবেলা থেকে শুনে আসছি অনেক আত্মীয় স্বজন আসছে, বাড়ি পরিষ্কার করো, বাজারে যাও, রান্নাবান্নার ব্যাবস্থা করো– নাহলে তারা কি বলবে! জন্মদিন, বিয়ে, পৈতে, সবকিছুতেই আগে আত্মীয় স্বজনদের কথা চিন্তা করতে হবে! আর ছোট্ট আমি অবাক হয়ে ভাবতাম– আসেতো সেই বকুল পিশি, রমা পিশি, অমুক কাকু, তমুক জেঠি, তাদের তো আমি চিনি! তাহলে আত্মীয় আর স্বজন লোক দুজনকে দেখিনা কেন? তারা কোথায়? আমার দৃঢ় ধারনা ছিল আত্মীয় আর স্বজন এই দুই মহান ব্যক্তির জন্য এত আয়োজন, কিন্তু তাঁরা কখনোই আসেন না!!

একবার আমাদের বাড়ীতে ঊনিশজন অতিথি একসাথে এসেছিলেন কোনোপ্রকার খবরাখবর না দিয়ে! এরা নাকি সবাই লতায় পাতায় আমাদের আত্মীয়! দলবেধে কলকাতায় এসেছিলেন কালীঘাটে পূজো দিতে, ঠিক করেন যে কোলকাতায় এসেছি যখন তখন একবার সাবিত্রী অর্থাৎ আমার ঠাকুরমার সাথে দেখা করে, রাত টা সেখানে কাটিয়ে পরের দিন ফিরলেই হবে!!! সেদিন আমার মাকে রান্নায় সাহায্য করতে নিজে থেকে এগিয়ে এসেছিলেন পাশের বাড়ীর মাসিমনি আর মায়ের বন্ধু দূর্গা পিশি! আত্মীয়েরা ব্যস্ত ছিলেন ঠাকুরমা আর বাবার সাথে পুরনোদিনের স্মৃতি রোমন্থনে!

এই ঘটনাটি আমার মনে গভীর দাগ কেটেছিল এবং অনেক প্রশ্ন জাগিয়েছিল। আমি তখন স্কুলের নবম বা দশম শ্রেনীর ছাত্রী– বাবাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম আত্মীয় মানে কি? বাবা উত্তর দিয়েছিলেন আত্মীয় শব্দটি এসেছে সংস্কৃত শব্দ আত্মন থেকে! অর্থাৎ "a close relative"। যে আমাদের পরিবারের অংশ। বাবা আমার জিজ্ঞাসু দৃষ্টির তাকিয়ে বুঝিয়েছিলেন যে আত্মীয়রাই তো আমাদের আপন, বিপদে আপদে, সুখে দু:খে এদেরকেই সবসময় পাশে পাবে। আর এরা আমাদের ভালোবাসে বোলেইতো আমাদের কাছে আসেন।

আমার অনেক দমবন্ধ করা প্রশ্ন ছিল, কিন্তু বুঝেছিলাম সে সব প্রশ্ন করলে ধৃষ্টতা হবে! শুধু জিজ্ঞাসা করেছিলাম ছবি জেঠি, মাসিমনি, দূর্গা পিশি, এরা তো সবসময় আমাদের বিপদে ছুটে আসেন, এরা কি আমাদের আত্মীয় হতে পারেন? বাবা একটু চুপ করে থেকে বলেছিলেন – নিশ্চই! তোমার মন থেকে কাউকে সে জায়গায় বসাতে চাও, তবে নিশ্চই সে তোমার আত্মীয়!

আমার মনে হয়েছিল হঠাৎ যেন ঠান্ডা হাওয়া আমার ওপর দিয়ে বয়ে গেল, বুক ভরে নিশ্বাস নিতে পারলাম!
তাহলে আমার স্বাধীনতা আছে আমার পছন্দের, আমার ভালবাসার, আমার শ্রদ্ধার কাউকে আত্মীয়ের আসনে বসাবার, তার জন্য পারিবারিক গাঁটের বন্ধন খুঁজতে হবেনা!
সেদিন থেকে আমার চারপাশে তাকিয়ে দেখতে শুরু করলাম এবং মনে মনে বেছে নিতে থাকলাম আমার পরম আত্মীয়! কেউ জানলনা, কাউকে জানালামনা, শুধু আমার কিশোরী মন জানতে থাকলো!

সেদিনের সেই ছেলেমানুষী মনে যে বীজ রোপন হয়েছিল, আজও তা বহাল আছে, কিছু পরিপক্কতা পেয়েছে এই টুকুই !
জীবনের পথে চলতে চলতে এমন কিছু মানুষের সান্নিধ্য পাবার সৌভাগ্য হয়েছে যে তাঁরা আমার পরম আত্মীয়র থেকেও বেশী এখন। জীবনের বিরাট স্হান জুড়ে আছেন তারা! কোভিডের মর্মান্তিক সময়ে বিশেষ পারিবারিক কারনে ৩২ বছরের ফিলাডেলফিয়ার জীবন পিছনে ফেলে চলে আসি অচেনা অজানা শহর অস্টিনে। সেই অন্ধকার সময়ে কয়েকজন যে ভাবে আমাদের অন্তরের অভ্যর্থনা দিয়ে আপন করে নিয়েছিলেন, তাঁদের আত্মীয় ছাড়া কি বলব? দিনে দিনে সেই সংখ্যা আরও বৃহত্তর হচ্ছে !

পরমহংসদেবের কথামৃত হাতে নিয়ে বলি – মন, তুমি আরও প্রসারিত হও, ঊষার প্রথম কিরনের আলোর আভাসে মনের কলুষতা দূর করো, হাত বাড়াও, হাতে হাত ধরো, সীমাবদ্ধতার গন্ডী ছেড়ে মন বেড়িয়ে পরো– পৃথিবী জুড়ে তোমার আত্মীয় ছড়িয়ে আছে!!

পৃথিবী জুড়ে তোমার আত্মীয় ছড়িয়ে আছে!!

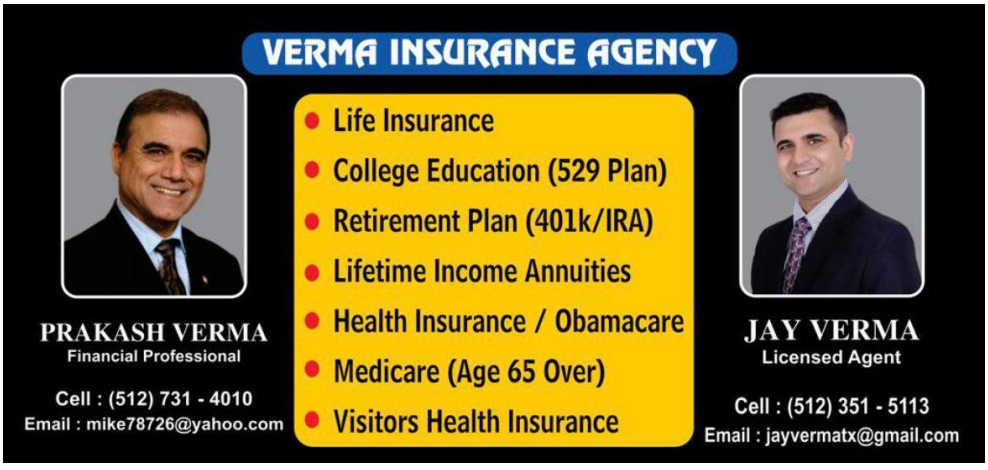

তেঁনাদের কথা - A spooky introspection of Bengali Ghosts

তানিয়া মুখার্জী

Definition of বঙ্গ সন্তান:
অফিস-মিটিং,স্ট্রেস-ইটিং, মাঝে হালকা দাদুর গান,
ঋতু-ঋত্বিক-মানিক-মৃনাল, সঙ্গে সৃজিত-মীরের Pun.
চকমিলানো বারান্দা আর সেপিয়া টোনে সেলফি,
ঠাম্মির গরদ শাড়ি'র পরে হার্ট ইমোজির ভেলকি।।।
কাফকা-কামু, শার্লক-মামু, লুকিয়ে ওই ভূতের রাজা ,
অল্প-কল্প-গল্প মাঝে, আমেজেই নিন আসল মজা ।।।

কোনো সন্দেহ নেই যে আমরা বাঙালিরা "বাই নেচার" ভীষণ ভাবেই ভীতি, মানে ইতি, মানে স্মৃতি, মানে ওই অতীত বিলাসী। নস্টালে'ই আমাদের "জিয়াও জ্বলে, জানও জ্বলে"। আর এই জন্যই আমাদের সাহিত্যে ও পপুলার কালচারে ভূত একটা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ জায়গা দখল করে আছে। তাই, আজ কি শাম এ জফর, ভুত কে নাম হ্যা ইয়ে সফর।

আমি ছোটবেলা থেকেই ভীষণ ভূত-প্রেমী। ভূতের প্রতি আমার "ধিকি ধিকি জ্বালা বুকের মাঝে" এতটাই বেশি যে ভবিষ্যতের স্বপ্নেও বহুবার নিজেকে রিকার্সিভলি ভূত হতে দেখেছি। এখনও সানডে সাসপেন্স হাঁ করে শুনি। মনে গভীর সাধ জীবনে একবার অন্তত একখানা ভূত পোষার। ডাকনাম রাখবো খোকা। এবছর যখন শুনলাম শীর্ষেন্দুবাবু এবারের পূজাবার্ষিকীতে ওনার বছরপ্রতি বরাদ্দ অদ্ভুতুড়ে উপন্যাস খানা লিখলেন না, মনটা এমনই পানসে হয়ে গেলো যে ভাবছি, এবার আর আনন্দমেলাই কিনব না। আমাদের বাংলা সাহিত্যে ও বাঙালীর মননে যে ভাবে সর্বদা ভূতের অবাধ বিচরণ, তা পৃথিবীর আর অন্য কোনো খানে "পাবে নাকো তুমি"। আমরা যেমন মা বাবার ভাই বোন ও তুতোদের শুধুমাত্র আংকল আন্টি কাজিন বলে ছেড়ে দিইনি, তাদের বেশ ভালো করে মাসি-পিসি,মামা-জেঠু-কাকু, খুড়তুতো-পিসতুতো তে দাগিয়ে দিয়েছি; তেমনি তেঁনাদেরও শুধু পেত্নী বা জাস্ট ভূত বলে সালটে দিইনি। একেবারে visa-form এর মতোই categorically by job affiliation, marital status, location, dietary restriction মেনে শাঁকচুন্নি, ডাকিনি, যোগিনী, ডামরী, ব্রহ্মদৈত্যি, মেছোভূত, গেছোভূত, বেঁশোভূত, মামদো, স্কন্দকাটা, কানাভুলো, আলেয়া, নিশি, রাক্ষস, খোক্কস, জীন, বেতাল ও আরো নানা প্রকারে ভাগ করে রেখেছি। পুরো ভূতেদের বাফে @আমাদের মনের প্রিয়া কাফে। সবার ডিটেলস দিতে হলে এখানেই ভূতপুরাণ লিখে ফেলতে হবে। তাই শুধু কয়েকজনের কথাই বলি, এই যেমন বেলগাছে থাকে ব্রহ্মদৈত্যি, তিনি আবার স্ট্রিক্ট ব্যাচেলর। মহিলাদের ছায়াও মাড়ান না, খান স্রেফ "দই চিড়ে" ! তাছাড়া আছে headless স্কন্দকাটা, আছে মুসলমানী মামদো ভূত। আছেন বিবাহিতা শাঁখা সিন্দূর পরা শঙ্খচূর্ণী বা শাকচুন্নি, আবার আছেন মাছ খেকো মেছোপেঁত্নি। সত্যি! মাছের লোভ আর পুঞ্জীভূত ক্ষোভ বাঙালির মরেও যায় না। এছাড়াও আছে নিশি, আলেয়া ,কানাভুলো, আছে one-eyed একানড়ে। ছোটবেলাতে সারা সন্ধে এসব শুনে, রাতের বেলা বাথরুম যেতে হলে কোনো ভাইবোনকে ডেকে সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়া হতো ও তাকে নির্দেশ দেয়া হতো, "এই তুই বাইরে দাঁড়িয়ে বকবক করতে থাক", আর কাজ শেষ হলেই দুজন মিলে চোঁ-চা দৌড় দিয়ে ব্যাক টু লেপের তলা।

মায়ের সাথে সেদিন এসব পুরোনো গল্প করছিলাম। মা হেসে বললো, ওই "ভূতের ভবিষৎ" সিনেমাটা দেখিসনি, আজকাল এতো ভিড়, এতো আওয়াজ-কুচকাওয়াজ, বেচারা সব ভূত-পেত্নী কোথায় গেছে কে জানে ! আগে তোর বড়মাসীর বাড়ি থেকে ফিরতে রাত হলে বিধাননগরের জঙ্গলের পাশের রাস্তা দিয়ে আসতে ভয় পেতাম, আজকাল ওই রাস্তায় কত আলো, দোকানপাট, গাড়িঘোড়া গিজগিজ করছে। জল বুজিয়ে নতুন মল হয়েছে। কথাটা আমার বেশ মনে ধরলো।

সত্যিতো আজকাল ভূতগুলো সব থাকে কোথায়? ভূতেদের যে সব ন্যাচারাল হাবিট্যাট মানে জলা-জংলা, হানাবাড়ী, পুরোনো চিলেকোঠা সব যখন হারিয়ে গেছে । কোথাও না কোথাও তো নিশ্চয়ই তাঁরা আছে, বর্তমানের সাথে এডজাস্ট করে। আর সত্যি কথা বললে গ্লোবাল বাঙালি মরে ভূত হয়ে যে শুধুমাত্র বাংলাতেই ফিরে যাবে সে কথা ভাবা কি খুব বেশি যুক্তিযুক্ত ? সারা জীবন বোস্টন বা বেঙ্গালুরুতে কাটিয়ে মরার পর খামোকা বাঙুর রিটার্ন? কেন মশাই, আল্লাদ নাকি? এই যে বিশাল বিশাল বহুতল অফিস বিল্ডিংগুলো। সূর্য ঢললেই ওগুলো কিরম খালি হয়ে যায়, ওগুলো কি সত্যিই খালি। অথবা mall গুলো? আমি তো ঠিক করেই রেখেছি "পেত্নী হওয়ার পর অস্টিন লাইব্রেরির টপ-ফ্লোরের কোনো একটা কিউবিকলে জাঁকিয়ে বসবো। এই যে mall এ সারাদিন কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ম্যানিকুইন গুলো, ওরা কি রাতের বেলা চলে ফিরে বেড়ায় না? আপনার কি মনে হয় ওদের জামা কে বদলে দেয় রোজ রোজ ? হুঁ-হুঁ আপনি বুঝি ভাবেন দোকানে যে কাজ করে সেই মেয়েটি ? আর দোকানে কাজ করা সেই মেয়েটি ভাবে যে অন্য মেয়েটি করে। আমি বেশ নিশ্চিত যে বর্তমানে সুপারমার্কেট এর ননভেজ আর শুশি সেকশনে আমাদের মেছো পেত্নী দিদি থাকেন। দিনের বেলা মনে হয় ওদের ওই বিশাল ফ্রীজারে ঢুকে বসে থাকে আর রাতের বেলা মাছ মাংস রাখার শোকেসে বসে ঠ্যাং দোলায় আর নাকিসুরে গান গায়, "আজ কি রাত মজা হিলসা কা, কাঁটো সে লিজিয়ে"। তাছাড়া বহুতল পার্কিং-লট, গ্যারেজ, কনস্ট্রাকশন সাইট, মেট্রো স্টেশন, ফ্লাইওভার এর নিচে বাদুড়ঝোলা হয়ে থাকা অথবা লিফ্ট এর শুট, আপেল-ম্যাপসের রুট .... এগুলো কি সেকেলে গুমনামী ঘোসটিং বা বাঁশবনে বেনচিং এর চেয়ে বেটার ও আরও ইনোভেটিভ না?

এমনকি আমার মনে হয় আমার আপনার বাড়িতেও দু-একটা করে খুচরো ভূত থাকে। এই ধরুন খালি ল্যাপটপের বাক্সতে, রান্নাঘরের উঁচু তাকের কোনটায় তো নিশ্চয়ই আছে। ওই ব্যাটা'রাই সুযোগ পেলে আমার লাঞ্চ বক্সের ঢাকাগুলো গুম করে দেয়, বিস্কুট চানাচুরের কৌটোর ঢাকা আলগা করে রাখে, যাতে সেগুলো মিইয়ে যায় ! তাছাড়া ফোল্ডিং ছাতার ভাঁজে, এদিক ওদিকের লুকোনো খাঁজে, মানে ওই আলমারির কোনায় ঝুলানো অনেকদিন না-পরা কোটের খাঁজে আর কি, অথবা আবার খালি সুটকেসে ঝাড়লে কি আর দশটা খুঁতের সাথে একদুটো শুকনো ভূত বেরোবে না? আমি নিশ্চিত যে AC র ভেন্টে তো নির্ঘাত হিংসুটে কেউ থাকে, যে দিনের বেলা ঘরটাকে আর ধড়টাকে আরো গরম করে আর রাতে ঘুম এলেই এসি টাকে ভয়ানক ঠান্ডা করে মানুষ জন্তুটাকে জ্যান্ত জমিয়ে মারার চেষ্টা করে। ল্যাপটপ কীবোর্ড এর K টা কেন এতদিন ধরে অকেজো, কখনো ভেবে দেখেছেন? Keys গুলো কাজ করবে কি করে? ওগুলোর তলায় ঢুকে ঘুমোচ্ছে জীন; বার বার ঠোকা মারলে, খোঁচা দিলে তবে তারা নড়ে-চড়ে বেরিয়ে আসে। ছুঁচে সুতো পড়াতে পারছেন না? ভাবছেন চোখ খারাপ? আজ্ঞে না, ওই ছুঁচের ফুটোয় জমে আছে কিছু ট্রান্সপারেন্ট টিকলিশ ভূত, সুতো দিয়ে সুড়সুড়ি দিতে থাকুন, দেখবেন ঠিক পালাবে। ওই একই ভূত গিয়ে ঢোকে আবার তালার ভেতর, তাই তো চাবি ঢুকিয়ে চাবি ঘুরছে না! তেল দিয়ে দিন, সড়াৎ করে পিছলে পালিয়ে যাবে। এছাড়া বাগানে জল দেয়ার পাইপে, জুতোর তাকের কোনায় রাখা গামবুটে, ফ্ল্যাট স্ক্রিন টিভির পেছনে আরামসে বসে আছেন তেঁনারা। দেখবার চোখ, শোনবার কান চাই মশাই, ভূতচক্ষু আর জিনকর্ণ বোমকে গেলেই চমকে গিয়ে দেখবেন চারপাশ কিরকম ফিসফিস করা ভূতে গিজগিজ করছে।

শুধু স্থাবর বা যাযাবর জগৎ না দাদাদিদিরা, ভার্চুয়াল গোয়ালও ভূত-মুক্ত নয়। একটু মন দিয়ে দেখলেই বুঝতে পারবেন আশেপাশেই ভার্চুয়াল লীলা -অবলীলায় ছড়িয়ে আছে আবহমান ওঁনাদের অদৃশ্য আঙুলের ছাপ। আপনার অনলাইন শপিং কার্টে বাস করছে আলেয়া, যে থেকে থেকে আপনাকে হাতছানি দিয়ে ডাকে "এসো এসো কাজ কর্ম ছেড়ে আমার কাছে এসো"। আর আগের যুগের কানাভুলো যে মাঠে ঘাটে লোকজনকে পথ ভোলাতো, সে গিয়ে নিশ্চই ঢুকেছে GPS এর ভেতর, তাই তো বারবার রাস্তা গুলিয়ে detour এর ছুতোয় আপনাকে টোল রাস্তায় তুলে দেয়। আমাদের অনলাইন গানের প্লেলিস্ট আর নেটফ্লিক্সও ওঁনাদের দখলে। এই যে আপনার স্পটিফাই এর প্লেলিস্ট shuffle এ রাখলেও বার বার একটা গান ঘুরেফিরে এসে বলে "আমি যে তোমার", সে যতই আপনি স্কিপ করুন, ঠিক দুটো গান পর আবার সেই গান হাজির, অথবা ঠিক মনে আছে কাল না শেষ করা নেটফ্লিক্স সিনেমা বা সিরিজ ঠিক ১ ঘন্টা ৫ মিনিটে পজ করে আপনি ঘুমোতে গেছিলেন, আজকে কিন্তু আর সেটা কন্টিনিউ

ওয়াচিং লিস্টে দেখাচ্ছে না। আপনি বুঝি ভাবলেন ওটা স্ট্রিমিং-গ্লিচ? না, মশাই না। এটা ওই "অমৃতের ভান্ড" না পাওয়া "তেনাদেরই কান্ড"। আপনি নশ্বর মানুষ, আপনার তেষ্টা-ঘুম আছে তাই বলে তিনি কেন ঘুমোবেন? আপনি তাই ঘুমের দেশে পাশবালিশ নিয়ে ডুবে যাওয়ার পর উনি একাই আপনার না-দেখা বাকি সিনেমা বা সিরিজ বিঞ্জ করে ফেলেছেন। ওনারাই ফিরে ফিরে শোনা গান আবার শোনায়, দেখা সিনেমা আবার দেখায় আর সেটা আমরা না দেখতে-শুনতে চাইলে অমনি বিরক্ত হয়ে কর্কর আওয়াজ করে অথবা হুট্ করে ইন্টারনেট কানেকশন কেটে দেয়। স্লো করে দেয় wi-fi স্পিড। পাজির পা ঝাড়া এঁরা ! আর আপনি যত বড়োই ভূতে নাবিশ্বাসী হোন না কেন, একথা তো নির্ঘাত বুঝতেই পেরেছেন যে আমাদের সবার স্মার্ট ফোনে সূক্ষ্ম দেহে ঢুকে বসে আছেন এক ভয়ানক নিশি, যার প্রতিটি প্রতীকী কুহকে আপনি-আমি মাঝে মাঝেই পড়ে যাই এক অন্তহীন এক কুয়োতে। কিছুতেই চোখ সরাতে পারিনা ওই মায়াবী নীল-স্ক্রিন আলেয়ার হাতছানি। আমাদের নাওয়া-খাওয়া, জেগে থাকা বা ঘুমে কাদা, কাজ-অবসর, আরাম-বিরাম, ইহকাল-পরকাল, প্রেম-ট্রেম, ভাষা-ভালোবাসা, হাসিনা-মমতা, আন্তরিকতা-যান্ত্রিকতা এমন কি পটিব্রেক পর্যন্ত আজকাল মায়া হয়ে গেছে। যাওয়া-আসার কম্যুট-টাইম বাঁচাতে এই তেঁনারা-ওঁনারা এখন যেন প্ল্যান করেই সবসময়ের সহযাত্রী, সহবাসী, তাই "ও ভূত, কাল আনা" দেয়াল লিখনেও কানাকড়ি লাভ নেই। তাই দাদা-দিদি-আদি-অনাদি এনাদের সঙ্গেই এখন থেকে love এ থাকুন ও থাকা প্রাকটিস করুন। সবথেকে কিউট-টাকে পারলে ইনফ্যাক্ট পুষে ফেলুন। তখন হ্যাপিলি বলতে পারবেন " I am totally ghosting "

Graphics and Illustration , Idea and concept : Tania Mukherjee,
Illustration : GPT4.0

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : তেঁনারা-ওঁনারা, প্রসেনজিত এবং AI

প্রহশন, প্রশাসন এবং

দেবস্মিতা পাল চ্যাটার্জী

বছরের মাঝামাঝি থেকেই হৃদস্পন্দন ঢাকের তালে চলতে শুরু করে।
আমি যে বাঙালি! আর আমার উৎসব পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছে।
আমার শিল্প, আমার সংস্কৃতি, আমার গান, আমার সাবেক সাজ,
চেনা মুখের কুশল বিনিময়.... পাঁচ মিশেলি ফুলের গন্ধ, ধুনোর ধোঁয়া!
সব কিছুর অপেক্ষায় দিন গোনা। সময় থমকে দেওয়ার অপেক্ষায় দিন গোনা।

এই বছরটাও সমান খাতে বইছিল।
আমার মধ্যবিত্ত জীবনের, মধ্য বয়সের নানা কার্যকলাপ
মধ্য গতিতে দিব্য আবহমান ছিল।
আজকাল আমার আবেগ, অনুভূতিগুলোও মধ্য পন্থায় চলে।
হাসি কম, রাগি কম, দুঃখ পাওয়ার বদলে মুষড়ে থাকি।
অন্যায় দেখলে দীর্ঘশ্বাস ফেলে দায় সারি।
কৃতিত্ব দেখলে ফেসবুকে অন্যের পোস্টে বাহবা জনক কমেন্ট দেই।

এমন সমালোচনা, পর্যালোচনা, কিছু সাহিত্য তথা রসনা চর্চা
এবং অতিথি আপ্যায়ন ও আতিথেয়তা রক্ষা করে;
দিন মৃদু মন্দ গতিতে কেটে যাচ্ছিল।
সংবাদ মাধ্যমে অভ্যেসবশত সকাল সন্ধ্যে চোখ রাখি।
বিনোদন জগতের খবরে ছয়লাপ, রাজনৈতিক খবরের অপলাপ।
আমার চেতনা আর যুক্তিকে কেমন গ্রাস করতে শুরু করেছে।
মাঝে মধ্যে মনন চারা দিয়েই ঝিমিয়ে পরে।

আমার প্রজন্ম স্বাধীনতা সংগ্রাম দেখেনি, বিশ্ব যুদ্ধ দেখেনি।
আমার শান্তি প্রিয় ও আবেগপ্রবন দেশ, শান্তিতে থাকার সংগ্রাম করে।
আর আমিও অনুগত নাগরিক। দুর্নীতির বাজারে নীতির পথে থাকি।
অসহ্য দুর্নীতির খবরে, আমার দেশের শাসন ব্যবস্থার ওপর অটল আস্থা রাখি।
আর বিদেশে থাকার সুবাদে ভোটাধিকার অপচয়ে দিন দুয়েক আফসোস করি।

এমনই একদিন রোজকার অভ্যেসে,
সকালে চোখ খুলেই ঝাপসা দৃষ্টিতে,
খবরের পাতার দু পংক্তি শেষ করার আগেই
আমার আলসে দৃষ্টি সম্পূর্ণ সজাগ হয়ে উঠল।
বিদ্যুৎবেগে একের পর এক অক্ষরের সারি নিজে থেকে আত্মস্থ হতে থাকল।
মস্তিষ্কের প্রতিটা কোষ আমার অস্তিত্বকে কষায়িত করছে বারংবার।
দিনটা ৯ই অগস্ট ২০২৪

আর মুহূর্ত দেরী হল না বুঝতে
আমি একটি স্বধ্বংসী প্রজাতি, দুর্বল জাতি, লোভাতুর শ্রেণী
এবং অধম লিঙ্গের অন্তর্ভুক্ত একটি প্রাণী।
আমি যতই সম্মান ও স্বাধীনতার বড়াই করিনা কেন!
আদতে তা নেহাতই ঠুনকো।

সব থাকতেও আমার পৃথিবীতে আজ নিরন্তর যুদ্ধ।
আমার দেশ দুর্নীতির পরকাষ্ঠায়, ধর্মের নামে রাজনীতি চালায়।
আমার জাতি, ক্ষমতা ও লোভের খাতিরে মনুষ্যত্ব জলাঞ্জলি দিয়েছে।
আমার নারীত্ব যত না সমানাধিকার দাবি করেছে; তার উত্তরে বহুগুন লাঞ্ছিত, নিগ্রিহিত হয়েছে।

মাত্র বছর তিন আগেই,
আমাদের দুর্গোৎসব বিশ্ব দরবারে মানবতার ঐতিহ্য রূপে স্বীকৃতি পেয়েছে।
সেদিনের খবরে, এক অদ্ভুত তৃপ্তি, এক অমূল্য আনন্দে ভেতরটা ভরে গিয়েছিল।
আমি সেই জাতির মানুষ যারা নারী শক্তির আরাধনা করে।
প্রতি বছর আউরে নেয়, "যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা।"
আমরা সৃষ্টিকে অর্ধনারীশ্বর রূপে দেখি।
আজ কি হল যে আমার বিশ্বাসের কাঠামো এক লহমায় গুঁড়িয়ে গেল!

ভীষণ লজ্জা, অভিমান আর ততোধিক উদ্বেগ নিয়ে
পরের সূর্যোদয়ের অপেক্ষায় থাকে আমার সত্বা।
বরং বলি আমাদের সত্বা, আমার মত হাজার হাজার কোটি কোটি মানুষ,
যারা ঠিক বেঠিকের ভারসাম্য বজায় রাখতে রাখতে জীবন কাটায়।
ভীষণ এক অস্থিরতা, অসহিষ্ণুতা পুঞ্জীভূত হতে শুরু করেছে।
মানবতা ও পাশবতার সহাবস্থান এই পৃথিবীতে চিরকালের।
কিন্তু দানবিক, পৈশাচিক প্রতাপ মেনে নেব!
ছিঃ! ধিক্কার এই ব্যবস্থা কে!

দিনের আলো আর সত্য কিছুতেই গোপন করা যায়না।
আমাদের পিতৃপুরুষ যেমন বলেছেন স্বাধীনতা জন্মগত অধিকার।
তেমনই আমাদের জন্মগত বোধ চিনিয়ে দেয় ন্যায় আর অন্যায়কে।
তার জন্য কোন তালিমের প্রয়োজন পড়ে না।
সমাজের প্রতি স্তর, জাত, ধর্ম, পুরুষ, নারী নির্বিশেষে আজ এককাট্টা।
প্রস্তুত তাদের দ্রোহের আগ্নেয়গিরি নিয়ে।
এবারের শারদোৎসবে হোক আক্ষরিক অসুর দমন।

আমি সত্যিকারের বিদ্রোহ কি জানিনা।
তবে আজ নিজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে অনুভব করছি,
মান, হুশ, ন্যায়, সততা ও সম্মান টিকিয়ে রাখার আন্দোলনের নামই সভ্যতা।
আমাদের নতুন প্রজন্ম, তাদের সামগ্রিক আধুনিকতা
বা বখে যাওয়ার তকমা নস্যাৎ করে দেখিয়ে দিল–
ভাল আছে ও থাকবেই। মেরুদন্ড, সাথে মস্তিষ্ক আছে ও থাকবেই।
একটা বাংলা গানের কথা বড় মনে পড়ছে –
"সন্ধ্যে নামার সময় হলে পশ্চিমে নয়, পূবের দিকে,
মুখ ফিরিয়ে ভাববো আমি কোন দেশে রাত হচ্ছে ফিকে।"

A regular Saturday

Joyeeta Banerjee

The sun came out a little earlier today
Or, may be not
Past two weeks have been cloudy
and thus, it seems so.
It's 7:00, the clock says;
Me not waking up, it's Saturday.
A regular Saturday !

Morning tea,
Not the usual green;
Today, it's Darjeeling
with Madeleines.
The new tea-cups from Ikea,
green flowers on white
with no 'ears',
The warmth on my palms
the soothing gold
Cozy, peace and stories untold.
Pothos by the work -table, has one more leaf
Bright light green with the white ribs.
The flamingo plant is peeping red,
The last I saw this, was in May.
Ah! Not so much a regular Saturday!

Feel of the morning kiss,
the known whisper,
the look of the known face,
and the familiar walls;
Two posters of my bed
the blue world map
Ash and yellow quilt
All intact.
'Almost nine' - the known voice
The joys of familiarity,
The pleasures of a regular Saturday!

Starbucks Date
The coveted corner table
Mocha Latte, hot chocolate and muffin
Reminiscences of the past.
The couple by the window
Quiet and all smiles.
The lady is wearing a pink beanie
A single red rose by her side
A minute or two,
Only the fingers move.
Such beautiful fingers!
Not a single sound.
The man with the brown turtle-neck
Is all eyes to her stories
Love through signs.
Mute courtship.
Ah! Not at all a regular Saturday!

Pompei: Two-thousand-year-old whispers

Aurobindo Dasgupta

My name is Marcus. I am an Italian Archeologist. I live in Pompei, which is close to Naples, south of Rome on the east coast of Italy. The year is 2024. It is about 10 PM, and I am preparing to sleep. I am restless and apprehensive. I have a presentation in two days to my management at the company I work for. There were 10 bodies that were excavated recently in Pompei. I need to finish cataloging all of them, and I have only finished 6. I am on a deadline. I could lose my job. It makes my stomach churn just thinking about the meeting and how I could finish up.
Just before I sleep, I open one of the completed files to read the notes.

It is about Antonio. He was born in 55 AD in Pompei, to parents who worked at a bakery. Pompei was a prosperous and busy Roman port city. Traders from far away lands visited Pompei, which catered to sailors from all over the world. Antonio, the only son, was loved by his parents. When he was 5 years old, his parents took Antonio to the Bakery where he used to play with the kids of the other workers. He made a close friend that day, Cassius, with whom he used to play marbles. They got familiar with the bakery, the brick ovens, and how bread was made. When Antonio was 9 years old, the owner of the bakery employed him & Cassius for errands to sell bread. Antonio sold bread in the open-air theaters, and in impressive forums with huge statues. He served bread to the important townsfolk who discussed the future of Pompei. He sold bread in people's houses, with walls of white marble which were richly decorated. Antonio was fascinated by the colored paintings on the floors and walls. The houses had rooms with fountains and pools. Antonio, who was teenager wondered and dreamed of owning a house like that one day. He also had the opportunity to talk to the sailors from these distant lands about what lay beyond the blue ocean. What were sailor's towns like? In the picture-perfect view from Pompei was the blue ocean and the mountain, Vesuvius. He wondered what lay beyond it. What was there?

One night, when Antonio was 14 years old, he was peacefully asleep, Mount Vesuvius sent out a cloud of ash, dust, rocks 12 miles into the sky for 18 hours straight. 30 feet of ash settled on Pompei burying the buildings. Many roofs broke down due to the weight of the ash, leaving only the marble walls standing. Antonio like the others in Pompei was buried in ash as well. Antonio's relatives from Rome tried to locate him, and came to dig up the ash, but there was so much ash and debris that the coastline had moved out into the sea. Pompei had moved inland, its location was a mystery, until it was discovered by accident 18 centuries later. Antonio was forgotten for nearly 2000 years until he was excavated.

That was the end of Antonio's file. I, Marcus, the archaeologist, wondered whether it was a coincidence that the words "file" and "life" are composed of the same letters. I closed Antonio's file and smiled thinking about it. I felt grateful and content, and strangely did not feel nervous about my presentation anymore. With a smile, I quietly drifted off to a peaceful sleep.

An open public area and street in Pompeii uncovered from about 6 meters of ash. Photo from Dec 2023

Stadiums, floor designs, buildings preserved under ash for centuries provide a glimpse of life in Pompei

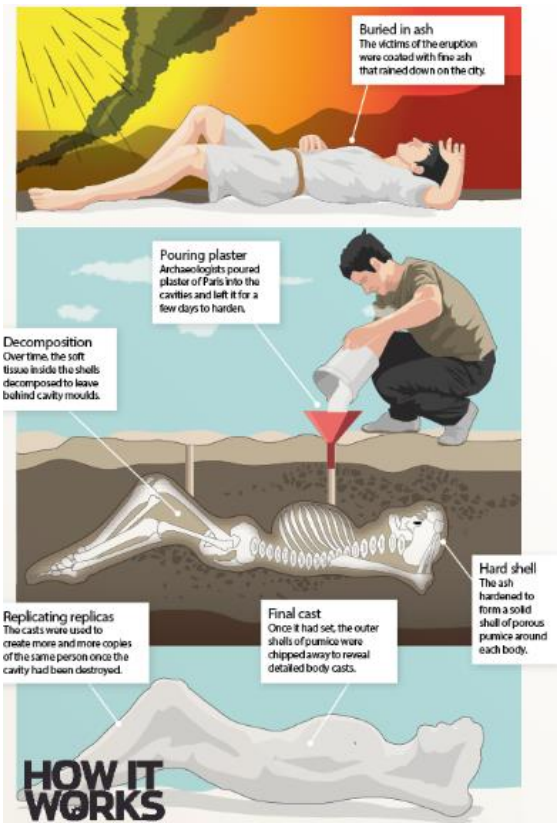

Plasters casts of Pompei citizens trapped under volcanic ash.

A Very Long Journey

Shivnath Dutta

It's generally believed that women hold the family, nay the society, together.

When Uma, my wife, and I were contemplating a move from Indy, Indiana in 2001, Austin, the capital of Texas, was at the top of our list of choices. While working in Toronto, from where we had moved to Indy a couple of years before, I had an opportunity to visit Austin. I liked the city and its diverse population as well as its music and cultural scene which was beginning to be recognized across the country. Also, the fact that the city and the adjoining areas rarely got any snowfall pleased me a great deal. After spending so many years grappling with snow, first in Saskatoon and then in Toronto, I had had enough of it already.

We were excited about our upcoming move and looked forward to living in a culturally vibrant city, new home, starting a new job and beginning a new life. Full of new aspirations, ambitions and excitement.

We didn't know anyone in Austin other than the people who had interviewed me for my job. But I had full faith in Uma's talent in this area. She was very good at making new friends whenever we landed in a new place. I remember once we were traveling through Albuquerque, New Mexico where we didn't know anyone. At the end of the day in our hotel room, she sat up on the bed with the phone in her hand and the local telephone directory by her side. She searched for people with the same last name as hers or mine. Before long, she was carrying on a conversation with a complete stranger as if they had known each other for a long time. That's how she had made a few friends in Indy. I had no doubt she would employ the same technique in Austin and develop a large network of friends in no time.

#

Our original plan was to leave Indy on September 11, 2001, but because of the horrible events of that morning, we delayed it by a day and left the following morning. I remember, not yet knowing the cause of the catastrophic events of the previous day, an eerie unease had accompanied us as we sped through the sparsely trafficked highways of Kentucky, Tennessee and Arkansas. I hoped and prayed that such a terrible incident at the beginning of our journey didn't presage anything ominous in the days to come.

We reached Austin on September 13.

Almost exactly a month later, the local Bengalis celebrated Durga Puja, the most important of Bengali festivals. We attended it and met some people and made a few friends. Back at home, Uma put her telephone skills to work, and we made a few more friends. Life was good, and we were happy with our move.

About a month later, like the unheralded appearance of an evil stranger at your door, Uma developed some serious health issues which made her physically and mentally very weak within a short time. Normally bubbly and vivacious, her life was suddenly turned upside down. Gone were the gossipy afternoons on the phone with the few local friends she had made. With her not working her telephone skills anymore, and I not having any skills in that area, our circle of friends remained woefully small. This was sad because both of us loved to have lots of friends.

For two years, buoyed by the latest medicines and the best available treatment, Uma fought hard to ward off the scourge that portended to destabilize our lives. Ultimately, however, her will to live was no match for her obdurate enemy. Despite her extraordinary tenacity, courage and optimism,

one somber afternoon she closed her eyes and never opened them again.
Few of us are ever prepared to face the loss of a near and dear one. I was no exception. Her death knocked the wind out of my sails and doused the fire in my belly. I began to live the life of a recluse, isolated from the small circle of friends Uma and I had built up during the short time she had available prior to her death.
About four years later, feeling miserable from an unsatiated emotional hunger, I decided to emerge from my self-imposed isolation. To my utter sadness, the world had moved on without me. My small circle of friends had become smaller, and the bonds that had connected me with my remaining friends had loosened. The intimacy that had governed our friendship before was no longer there. I felt like a stranger navigating my new world.

#

In 2001, when we decided to move to Austin, we never looked into the demography of my community, Bengalis, from where we would draw the oxygen for our day to day living. We didn't know the size of this community, or how many of them, if any, were near our age. Wherever we had lived prior to moving to Austin, we found at least some people who were in our age group and had similar interests. We assumed Austin would be no exception. But Austin largely was, which made our social life very limiting to begin with. After Uma's passing, this caused a serious inconvenience for me. I ended up spending most of my days alone within the four walls of my home. Thank goodness for my abiding interest in music and writing, which left me little time to mope and be despondent.

#

The appearance of Covid in 2020 made a bad situation worse! Because of my age, I was deemed to belong to the most vulnerable category, meaning I was among the most susceptible group to contract the deadly virus. This and because I lived alone, I had to be extra careful to avoid being impacted by it. Which necessitated my withdrawal back into the life of a recluse. Some of my friends appreciated my situation and respected my decision but the rest mistakenly believed I didn't want to rub shoulders with them for whatever reasons that made sense to them. Sadly, that thought has persisted even after I started going out since Covid became a lot less pervasive and much less virulent.

#

Despite all this, I must say the love and affection I have received from so many of my community members have filled me with immense gratitude. Sometimes the verbal expressions of their muted love have outpaced their willingness or ability to deliver on their commitments, which has led to some amusing experiences.
"Oh, you love luchis? No problem. You can have breakfast of luchi and mangsho at our home on any weekend," one of them said.
"But I don't eat mangsho," I said.
"In that case, I'll make aloor dom for you. Come on over any weekend."
"But it won't work that way. You've to tell me on which weekend you want me to come over," I said.
That was almost eight years ago. I'm still waiting for her to tell me.
And then, there was this woman who offered to treat me to khichuri someday. I had told her khichuri was one of my all time favorite foods. Her mother, who was visiting from Kolkata at the time and was sitting with us, heard our conversation.
"Why don't you invite him while I'm still here?" she said to her daughter. "I can give you a hand."
The mother has long since gone back to Kolkata, and I'm still waiting for that khichuri invitation.
And how about this invitation for Dosa?

“Any weekend! We often have Dosas for breakfast on weekends,” her husband said one evening. “We’ll call you tomorrow to set up a date.”
That was five years ago, and I’m still waiting for that call.
And then there are several stories about invitations which were cancelled for unforeseen circumstances with the promise of new dates that never came.
These amusing experiences are like humorous moments in the middle of Greek tragedies if there ever were any.

#

I have consciously tried to endear myself to everyone in the community I have come in contact with but apparently have failed a handful of them. How else can one explain, despite being in Austin for close to twenty-three years, I haven’t had the luxury of ever finding myself inside the homes of a number of long-time residents of our community all of who know me?

#

If Uma were alive and well, I’m sure my (our) luck with friends would be much different not only because, I believe, women are better at building and maintaining social contacts but also because she had the kind of social skills I never had and never will. But I’m enormously grateful to the few friends I still have whose selfless affection for me has touched my heart. They love me in spite of all my frailties and foibles without expecting anything in return. I had a few more over the course of my time here but, for reasons known only to them, I have fallen out of their favor. I live my days with the hope that perhaps time will heal whatever it was that caused the rift in the first place, and someday we will go back to the days of our earlier conviviality.

#

It will be twenty-three years this September since Uma and I moved to Austin. We came here with a certain set of ambitions, aspirations and expectations. But destiny took us to a very different trajectory. In all likelihood, this is my last move. The journey had begun years ago in an obscure little town in northern India, among people who felt like strangers, and near willow-lined streets and pristine meadows that made me feel like an alien. So I set out in search of a permanent place that would give me a sense of belonging. The search sent me on a passage through Kolkata to Saskatoon to Athens to Hamilton to Toronto to Indy finally landing me in Austin. Something inscrutable about this place called out to our hearts, and we felt mysteriously attached to it. It gave me what I had been searching for years, a sense of belonging. We decided to make our home here, among people we didn’t know, and on a street and in the neighborhood we hadn’t seen before. And, though, a crushing tragedy hit us in our early days, and the thought of giving up on this place often visited me in my solitary and contemplative hours, I couldn’t detach myself from it as if it had sewn my soul tautly into its bosom.

Reflections at Journeys' End

Sumit DasGupta

It has often been my refrain that every encounter, every experience from every journey imprints an enduring lesson or two in one's outlook, akin to altering one's DNA. It affects one's stance in ways small and large, and challenges whatever preconceived notions and biases one may have had prior to any venture. Best of all, it happens in an organic manner seeping through our synapses like free-flowing water on an even surface. It is one thing to read about a country, a culture or cuisine or watch a TV show and it is entirely different when one absorbs it by actually being there, so that it filters in through every sense in our being, through every sight, sound or smell. It is this all-encompassing sensation that still leaves us hungering for our next excursion to yet another distant destination. Thus it was for us on our recent foray across the ocean,… this time to Ireland and Scotland. So, in what follows, I shall delve into as many facets of our travels as possible to paint a comprehensive landscape of our experiences.

No article on these particular destinations can commence without pivoting first on the most important parameter, weather, the greatest variable like no other, that affects travel both in the British Isles and Emerald Isles (Ireland) and to a great extent the western part of Europe. And thus it was on our trip! For weeks prior to our departure, I had checked forecasts and historical data with the diligence of a scientist. I felt reassured that we would get at least half the days with sufficient sun, with occasional clouds, throughout the day. The end result was entirely different,… 4 days of sunshine, including one spent for travel, interspersed with two full, foul weeks of showers. I concluded shortly after our arrival that in both the isles, the job of the weatherman cannot be a sustainable source of income and that the weatherman's psyche would be severely impacted, perhaps irreparably, if they persisted in the failing, entirely unrewarding task of reading the mind of the resident weather ayatollah. But the seasoned, intrepid travelers that we are, we would not allow the weather gods to trifle with our plans. We soldiered through the wet days, often skipping from under one awning to another to get from one destination to the next. The weather was particularly vicious the day we travelled by luxury coach through many a picturesque town, village and countryside from Galway to the Cliffs of Moher in the northwestern coast of Ireland. It was an unfortunate coincidence that a hurricane that had kissed by the Carolina coast here shortly before our departure swept up through the northern Atlantic to reach the Irish coast the day we arrived at the "Cliffs." It was not at hurricane strength anymore, just a massive storm with cold, shearing winds and pelting rain. And with two expensive cameras to protect, I was more focused on wrapping them with my raincoat than myself. Every time the rain relented a bit, I would snap away but with the realization that they would never match the glorious photos that Irish travel websites post to lure travelers to this renowned tourist destination. So, by the time we had returned to the comfort of our waiting bus, I looked every bit of a "jhoro kaak" (i.e., storm-drenched crow, a portrayal that Bengalis will well appreciate) as I ever have! As consolation, our guide opined that in recent years, the weather in August (supposedly implying bright and tourist-friendly) has begun to resemble November weather (supposedly inclement and tourist-unfriendly) and of course, he was quick to fault climate change for it without accompanying data to support his claim.

There is a temptation to wrap a trip to a desirable destination with excess talk about the scenery. This trip was no different, so let me dispense of that topic next. No doubt, both Ireland and

Scotland are blessed with an abundance of scenic spots, recollections of which linger long in one's memory even if they fail in the photographs that are victims of the sullied weather. I have mentioned the Cliffs of Moher where the plateau at land's end descends precipitously to the water's edge, a sheer drop of near 800 feet, on the shores of the Atlantic. Near to shore, maybe a mile or two away, are islands that are coveted for their scenery which tourists can take a ferry to visit and where those steeped in acquired or inherited wealth have their hideaways. But on the day that we arrived at the shore, a ferry ride would have been a fool's errand. Our stops at Dublin, Galway and Killarney were memorable. Dublin is a beautiful city, a paradise for citizens and visitors alike, rich in culture, tradition, history and the arts. What most inspired us was the fact that so many authors and poets who had been an inseparable part of our English education were residents of this great citadel of learning. Trinity College, the renowned university, is to Ireland that Cambridge and Oxford are to England. Its old library is a hallowed institution albeit in a crumbling building desperately in need of urgent repairs but one that still performs its defined function. Most shelves in the Long Room have been hollowed out to lighten the load with only 16,000 manuscripts from its original trove of 200,000 still on display but those put away are stockpiled in boxes with QR codes so they can be readily retrieved to support researchers. The Book of Kells exhibited there provides a colorfully illustrated compilation of the 4 Christian gospels from Saints John, Luke, Mark and Matthew in stylized Latin. The story of its creation in the island of Iona, its transfer from Iona to Ireland while braving a storm in the dark of the night to thwart its capture and desecration by Viking hordes reads like a mystery novel. The National Library, small and intimate, was a place for contemplation. And what a treat it was to walk through the special exhibition on W.B. Yeats on the ground floor. We took a seat and listened to one recorded oration after another of some of his great poems. It was peaceful, tranquil and uplifting! Our stop at St. Patrick's Cathedral was inspired in part by the fact, often overlooked outside Dublin, that one of its past deacons was Jonathan Swift of Gulliver's Travels renown. Finally, no visit to Dublin is complete without a "pilgrimage" to the Guinness Brewery. It is indeed impressive to witness how they have perfected a process to turn an ancient grain, barley, into a high-quality, internationally-branded brew. It is equally satisfying to see how admirable a corporate citizen it is through its many good works! A small tidbit from the visit,... when Arthur Guinness started the brewery in the mid-1700's, he signed a 9000-year lease at a trifling sum of money. But now that the Guinness family have sold it to the Diageo Group, I wonder if that lease agreement is still in force. But despite all my new-found admiration for this enterprise, did I appreciate my free pint of stout? No, not a single sip of it,… even though I drank the entire glass. Never again,… stout is just not my style! But Ireland should not feel slighted for we expressed far greater appreciation for its other barley product, Irish whiskey, which we polished a liter of in just over a week.

Galway, a smaller city that serves as the gateway to the scenic spots on the northwest coast, like the Cliffs of Moher, sits adjoining its namesake bay. As part of our trip to Moher, we stopped at the Burren, pronounced "burn", a wide expanse of countryside where the hills and the valleys of grey limestone lie bare, chipped and eroded with plants and vegetation sprouting from the channels eroded by the flow of water. The guide explained how it all happened,... that about 4 million years back when the then solitary continent on Earth split up into multiple smaller continents, Ireland, still under water, barely separated from Brazil, began a steady race towards Europe, resting briefly as measured in evolutionary time near Spain, and then moved west to its present resting place. And in a final upsurge through tectonic shifts and volcanic eruptions, it emerged from the seabed to expose the surface to sunlight where it now sits. The Burren is a protected and untouched area,

removed from modern day exploitation by man. Galway's rich restaurant area that we frequented every evening and where getting seated for dinner was always a challenge thanks to the proliferation of tourists is a happening place that pulsates late into the night. On the train ride from Dublin to Galway, we were informed by 2 Indian students, one about to graduate with an MBA and another about to begin graduate studies in Data Analytics, that Galway has a renowned university, so we made it a part of our itinerary to visit this institution. And yes, the campus is quite impressive with ancient buildings projecting an aura of centuries-old knowledge and wisdom. Killarney, the smallest of the trio, offered much in scenery. Our trip to the Dingle Peninsula, advertised as one of the most picturesque parts of the country, did not disappoint,… dark, low clouds notwithstanding. We drove past exquisite scenery, sea on one side, rolling hills with wildflowers in a myriad colors sweeping by on the other. Close to the city, Torc Falls, small but feisty, impressed even yours truly who arrived there jaded by the memories of the 3 greatest Falls,… Niagara, Iguazu and Victoria. The lakes near Killarney, such as Lough Leane and Muckross Lake, add to its beauty and serenity and on a fog-shrouded day, a touch of mystery too! To satiate the fluid population of tourists, Killarney also boasts of a rich restaurant scene, with some of the bars offering an eclectic mix of music that reminded us of our own 6th Street.

Ireland's history is rich but tragic too, particularly when the British were the masters of this realm! The effects of the potato famines that afflicted this land in the mid-1850's still linger in some ways. Its population was halved from over 8 million from which it has yet to recover, half of the difference perished while the rest emigrated to America or Australia. On our tour to the coast from Killarney, our guide pointed to low, trapezoidal walls, about 3 feet tall, 2 feet at the top, 3 feet at the base, that meandered through the countryside with no rhyme or reason, stretching mile after mile aimlessly to the horizon and back. Known as "penny walls", starving Irishmen were paid a penny a day, a slice of bread and a bowl of soup by their English masters to haul the stones and assemble these walls in the midst of the famine with no purpose in mind except to keep them occupied. And even as they suffered, England continued its pilfering ways,… draining the land of meat and milk. No city in Ireland is complete without a street named after Daniel O'Connell, revered Catholic leader and benefactor of Ireland who rose from humble roots to become a barrister, then a Member of Parliament and then as the leader who shepherded laws through Parliament that unshackled Catholics from draconian laws that Protestants had enacted and enforced where, for instance, a Catholic could not even bury a deceased kin without prior permission. Yet while O'Connell is esteemed across the land, we drove by a derelict ruin of a roofless tenement whose outer walls were secured by angled wooden beams that is supposedly the birthplace of who else,… Daniel O'Connell! And why the wretched condition,… lack of funds! Imagine that! Last topic in this potpourri, Irish cuisine! The Irish are justifiably proud of their Irish stew and their seafood chowder, the very best of which we had, err, devoured, at a roadside restaurant on the way to Moher. With busloads of tourists stopping here for lunch, they have obviously had enough critical palates to perfect the recipes for both. They were the gold standard we compared all other restaurants to. So, why is there such a glaring divergence? And why is the repertoire in their native cuisine so shallow?

Our tour of Scotland began with a flight from Dublin to Edinburgh. Our driver from the airport provided us our initial introduction to the city which was anything but positive. A garrulous Afghan refugee, he seemed to have a distaste for every topic. He hated Americans and the Taliban with equal fervor both of whom he accused as conspiring bedfellows. And he despised the Scots! Fifteen years in this city have not mellowed his revulsion. A simple question about Scottish food

sent him reeling, so distressed was he that he could not remember the national dish, Haggis. When reminded, he dismissed it as “baqwas”, warning us to stay clear of Scottish fare, Haggis in particular, and instead pointing to ethnic restaurants, of which there were many, on our drive to the hotel. Warnings aside, what a marvelous city Edinburgh was and likewise, what a marvelous place we stayed at, The Ten Hill Place Hotel, was! Across the street from the hotel was the Royal College of Surgeons and Museum. The hotel is owned by a group of surgeons, all members of the Royal College, with 50% of the profits from the hotel contributed for research to the college. The hotel’s policies are quite high-minded, directed to achieve carbon neutrality, the first such hotel we have encountered in all our travels. We were less than a mile, a pleasant walk, from The Royal Mile that terminates on one end at the Palace of Holyroodhouse. Along the way to the Royal Mile were a string of ethnic restaurants where we had some very fine meals. The Royal Mile is a vibrant area, where locals and transients (that’s us!) congregate, milling around bars, restaurants and stores. A bagpiper played all day to entertain us. We found reason to be there every day, more than once a day. Edinburgh has so much in store for the visitor that the 3 days we spent there were entirely inadequate. A week would have done justice. But we touched many of the hot spots! Palace of Holyroodhouse was relatively understated, a smaller residence where the remains of Queen Elizabeth II lay in state before they were flown back to London. Edinburgh Castle, perched high on a hill that served for a brief period as a royal residence until the palace was completed, is an imposing structure with guns peering off the ramparts that in their heyday must have rained death, despair and destruction to adversaries in the valley below. St. Giles Cathedral, conveniently located on the Royal Mile, is a massive stone edifice that is as impressive from the outside as it is on the inside. It has an immense organ, befitting its size, large stained-glass windows and towering stone columns. The now-retired royal yacht, Brittania, quite unpretentious compared to today’s mega-yachts, was spacious enough for the royal family and their entourage of 50 attendants. The private quarters were quite unostentatious, even simple, but the formal areas where the monarch entertained invited guests and dignitaries were very opulent and stylish. Our last stop was at the National Museum of Scotland which conveniently was a short walk from our hotel. It was so interesting, so quirky, so seemingly haphazard. Objects were placed with apparently no theme in mind, except that they all involved some aspect of life, life yesterday and life today. There were exhibits from all corners of the planet, touching cultures and tribes from here, there and everywhere and with life-size copies of prehistoric creatures distributed amidst the cheerful chaos. It was a fabulous experience! Like Dublin, we felt a kinship to Edinburgh for so many of her favorite sons are intertwined with our upbringing, such as, Arthur Conan Doyle and his mystery novels and James Clerk Maxwell whose scientific discoveries underpinned my studies in Electrical Engineering. Inverness, located in the heart of the well-known barley fermenting region, was our second Scottish stop. I can just imagine the loud chuckles when I deny that it was not just the taste of Scotch Whisky (note the spelling, it is never “whiskey” if it must be Scotch) that lured us to this region but was only a part of the allure. Inverness is indeed a very pretty city nestled in a breathtakingly beautiful part of Scotland. So, our first day was spent on a road trip to another vacationers’ paradise, the Isle of Skye, a drive that skirted along the shores of Loch Ness for near an hour. Our guide regaled us with her knowledge of the area laced with ample measures of her wit. We learned a few interesting tidbits, that Isle of Skye is home to the Talisker Single Malt Distillery and to the Drambui Liquor Distillery, whose sovereign grant was awarded by Bonnie Prince Charlie, that Loch Ness is the largest lake by volume, length at 23 miles and maximum depth of over 900', in Scotland. But no, disappointingly, there is no Nessie tormenting creatures in the lake or around. However, scientists have done extensive investigations in recent years and

concluded there are very large fish and marine creatures deep in the dark, mysterious, undisturbed depths of the lake, one of which resembles an eel that may grow upto 5 meters in length and that on very rare occasions appear on the surface. Now, if coincidentally, an individual who has done one too many tastings of single malt in one of the many taverns in towns adjoining the road happens to be parked along the shore at the same time, voila, you have yet another authentic, malt-whisky-fogged sighting of Nessie.

Of course, no article on Scotland is complete without a few thoughts on their alcohol contribution and their cuisine to the world. To be fair and balanced to Scotland as we were to Ireland, we polished off a liter of Johnnie Walker Black in just over a week. But our bias towards Scotch was unmistakable. The visit to the Scotch Whisky Experience, one of our highlights in Edinburgh, began with a quick presentation on the process of making the golden elixir, following which we tasted a blended whisky and then 4 different single malt whiskies from 4 of the 5 whisky-making regions. SWE is quite a renowned institution that showcases a 3800-bottle collection of single malt and blended whiskies which we got the opportunity to visit as part of this tour. From Inverness, we took a special whisky-tasting tour to Dufftown, considered the capital of the Highland Whisky region, with stops at Tomatin (4 tastings,… all good, though on the light side) and Glen Moray (5 tastings,… none very satisfactory) distilleries. And now about their cuisine! Both Scotland and Ireland, with access to salt water, lay claim to Seafood Chowder, so hail to the competition to promote greater quality and flavor. We enjoyed it in both places. The same applies to Fish and Chips. The deep-fried, battered fish was good everywhere and why should it not be? How could one destroy freshly-caught Haddock from the nearby North Sea? But the fries,… ugh, with every serving we consumed, while the first few were quite acceptable when hot, the remainder rapidly turned to mush as soon as they cooled. Where were you McDonald's when we so painfully coveted your fries? Shepherd's Pie too is jointly claimed though we tried it only in Scotland and loved every morsel of it. And finally, there is Haggis! Made from kidneys, liver, stomach and often the heart of a sheep, with oats as a binding agent, it is unique! Taste it once and the metallic taste from the liver lingers,.., and lingers,… and lingers! On our ride to Dufftown, the guide asked if any of us had tried Scotland's contribution to haute cuisine and 14 voices rang out in unison, "Yes, but never again!" On a more somber note, while we can mock it for its poor taste today, it is a sad reflection on its genesis at a time, centuries in the past, when poverty-stricken Scots could ill-afford to waste anything that could be remotely edible, including the vital organs of animals they slaughtered for protein. The foreign restaurants we ate at were all good, particularly Dishoom in London which was excellent, but they were all owned by immigrants, held almost at arm's length. If only the natives would join these imports, they could hopefully acquire sufficient inspiration from the foreign recipes to create a genre of fusion food that would truly enrich the culinary scene. Else, it would remain like multiple ships passing each other in the night without even a wink or a wave!

So, to conclude, allow me a few more random thoughts! Unlike prior trips, we traveled a number of times by train. These were not high-speed marvels but very comfortable, medium-speed trains that rocked and rolled leisurely through the countryside, through periods of rain and shine, passing by tiny villages where no resident was a stranger, all of which added to the delight that emanates from travel to a new locale. Along the way, we met strangers on the train who were as inquisitive about us as we were of them, transcending complexions, cultures and citizenship. In the cities, we rode on hop-on, hop-off buses, stepping off to see a particular place of interest and then hopping on another bus that arrived an hour or two later. Through these journeys, we travelled through

parts of the city we would never have otherwise encountered, through myriad neighborhoods, some ancient and some not so much, past old tenements, all glued against each other in a row, that stood as silent testament to the city's past. Another facet that got our notice was the plethora of churches everywhere, sometimes next to each other, sometimes across from each other in a case of dueling denominations. To my heretofore uninformed mind, I had expected Ireland to be mostly Catholic and Scotland mostly Anglican. Not so in reality! We drove or walked past Catholic and Anglican churches of course but then there were Methodist, Protestant, and Lutheran churches and even a Baptist church for good measure. Inverness is a case in point! Bordering both sides of the River Ness, there were 6 churches, including its namesake cathedral on one end, all within a 150-yard radius. I often wondered whether this abundance of places of worship in these two nations is necessitated by extraordinary piety or for penance to compensate for the seeming overemphasis on alcohol and where bars may open by 10am every morning.

Puja
Tanishee Bose (7th Grade)

A Visit to a Baltic City – Oslo, Norway

Sunit K. Addy

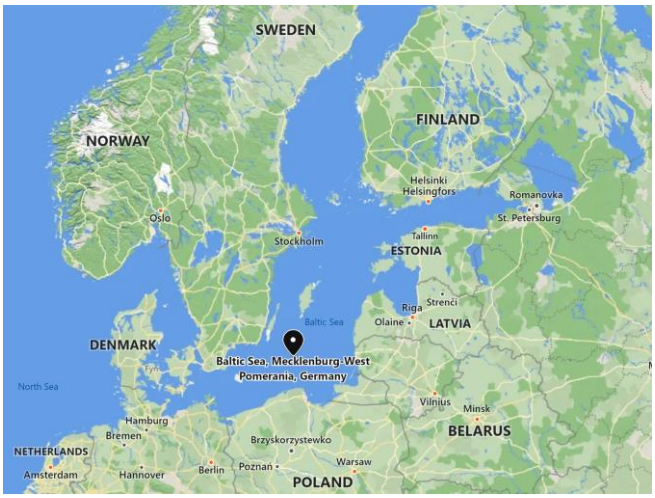

Our ship: Emerald Princess docked in Oslo and Map of Baltic Sea.

A visit to Oslo must include **Gustav Vigeland's (1869- 1943) Sculpture Park**. The Park has more than 200 sculptures of bronze, granite and wrought iron and although the subject matters of most of his art is not beyond controversy, they strike the visitors with their grandeurs and beauty. I have never seen so many modern sculptures and the extent of human expressions depicted in them. The Artist lived through many uncertain political scenarios and in these years the themes that dominated his works were "death and the relationship between man and woman". He was one of the most noted Norwegian sculptors and he designed the Noble Peace prize medals. We spent several hours going through his works and how he installed these statues with his innermost feelings.

The Granite Monolith, which took him 14 years to finish from the clay modeling in beginning and to the final completion. This monolith can be seen from any part of the Park.

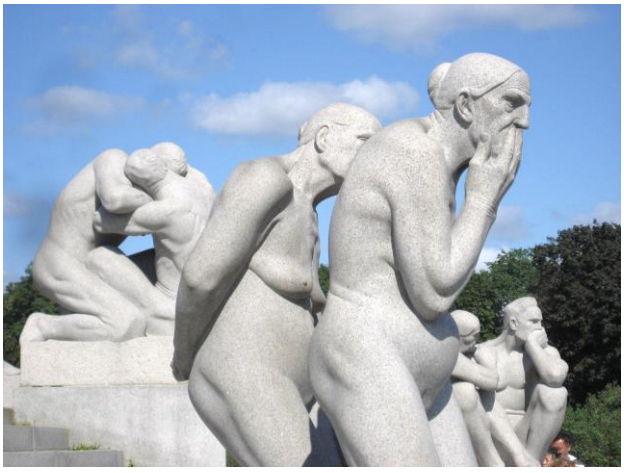

The Granite Monolith and surroundings and the awe-stricken men, women and children

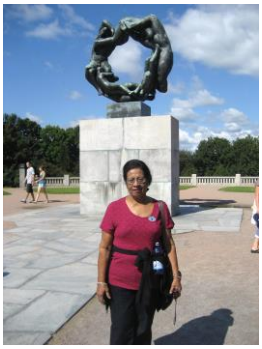

The granite Monolith and a circle formed by fused bronze bodies. The latter we both called “human writhe”.

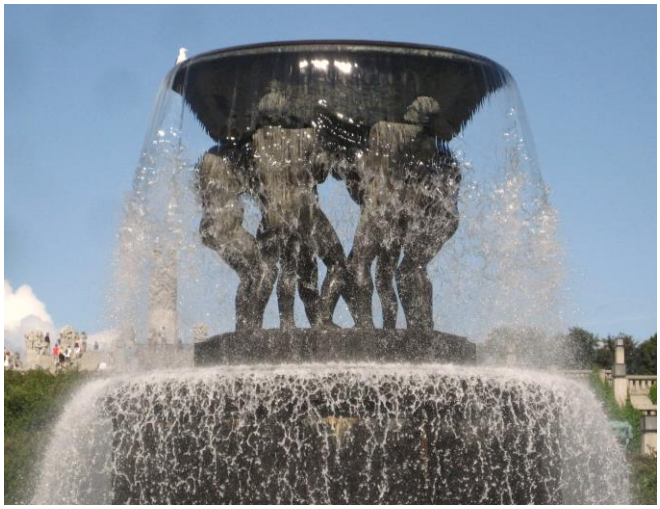

A fountain and a sun dial with zodiac symbols

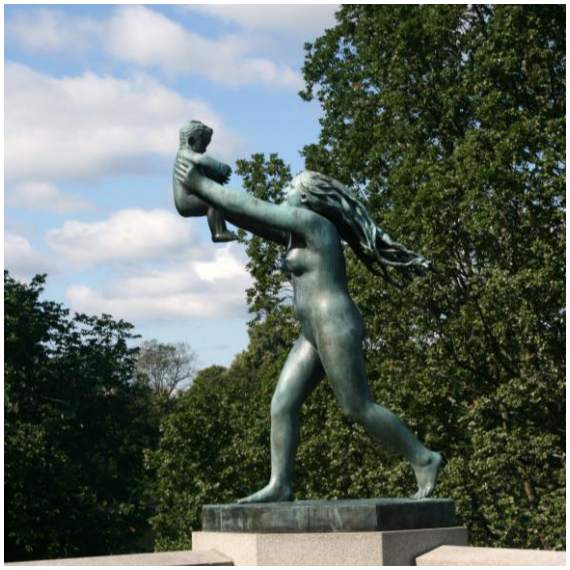

A mother and a father playing with their children

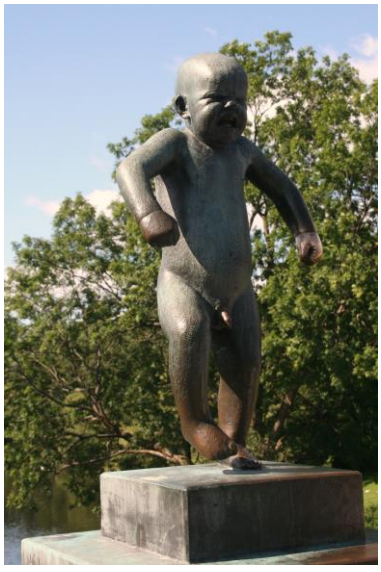

Angry child and happy boys

Viking Museum, Oslo: Visit the 1000yrs older Viking ships and they and are fully restored for display. Since they were recovered from great depths in the fjords and were buried in sub-zero temperature in anaerobic conditions, they were perfectly preserved. As a matter of fact, the guide told us that she wished that the Vikings had submerged a few more such ships in their burial rituals because they are valued as extremely rare and in great condition and were preserved in great shape.

Helge Ingstad and Anne Stine Ingstad were the lead archeologists in this investigation.

The Vikings were extremely skillful and great sea-men. They explored the whole Northern Europe from this area.

Restored cargoes in the sunken ships. The Vikings were great sea men.

Our next stop was to visit the ski-simulator. Winter Olympic Games were held in Oslo, Norway in 1952. I went to the top of the ski slope and the view was excellent.

Nobel Peace Prize Hall: This is the venue for the Nobel Peace Prize and normally it is held in October to December to coincide with the anniversary of the death of Alfred Nobel. Along with the Peace prize other prizes in Chemistry, Physics, and Physiology or Medicine and Literature are also awarded in accordance with Alfred Nobel's Will. The Norwegian Parliament appoints the Nobel Committee which selects the Nobel laureates. (extracted from Wikipedia). The Peace Prize is the highest HONOR one human being can get. And just being there standing in the Hall, I thought that I am being blessed.

While returning to the Ship across the Fiord, I had a great Feeling

Katyayani – Sanghamitra (Mithu) Deb
Media: hand made paper pulp with inclusions of newspaper, bel pata, Jaba phool and ropes.

Congratulation !
Recent Graduates

Aatmodhee Goswami
Graduating from: Dharitri Homeschool
Going to : UT Austin
Major : Computer Science

Anish Saha
Graduating from: Mcneil High School
Going to : UT Austin
Major : Civil Engineering

Arnab Chowdhury
Graduated From: Vandegrift High School
Going to: Texas A&M
Major : Biochemistry

Arushi Adhikary
Graduating from : Cedar Ridge High School
Going to : Texas A&M
Major: Biomedical Engineering

Congratulation !
Recent Graduates

Shaunak Pandey Bhattacharjee
Graduating from : Vandegrift H S
Going to : Yale University
Major: Applied Mathematics and Economics

Shrutodhee Goswami
Graduating from: Dharitri Homeschool
Going to : Texas A&M
Major : Biology(Hons)

Shubhangi Bhattacharya
Graduating from: Westwood School
Going to : Texas A&M
Major : Business

Tanisha Banerjee
Graduated From: Lake Travis High School
Going to: Texas A&M
Major : Finance

Aspiration, before taking Flight - Ratula Sarkar

SHIVA JEWELERS

Austin's Premier South Asian Jewelry store

Lakeline Plaza
11066 Pecan Park Blvd Ste 520
Cedar Park, TX 78613
512-567-6372
www.shivajewelers.com
info@shivajewelers.com

Celebrating Traditions

SIJO VADAKKAN

BROKER, GRI, CNE

TRINITY TEXAS REALTY INC.

Integrity and Excellence in Real Estate

512 740 2262/512 279 4596 sijo@trinitytxrealty.com

2251 S Bagdad Rd, Bldg1,Ste 101-102, Cedar Park, TX 78613.

www.trinitytexasrealty.com